২৩ সেপ্টেম্বর ২০১২

রবি

কাঁকড়ার জাত

সমরেশ মজুমদারের মৌষলকাল | দীপঙ্কর দাসের গল্প

বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নভেলেট

পত্রিকাটি ধুলো খেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ড কপি এবং স্ক্যান করে দিয়েছেন শুভজিত কুণ্ড

এডিট করেছেন সুজিত কুণ্ড

একটি আবেদন

আপনাদের কাছে যদি এরকমই কোনো পুরোনো আকর্ষণীয় পত্রিকা থাকে এবং আপনিও যদি আমাদের মতো এই মহান আভিযানের শরীক হতে চান, অনুগ্রহ করে নিচে দেওয়া ই-মেইল মারফত যোগাযোগ করুন।

e-mail : optifmcvbertron@gmail.com

www.greenvalleyskyscraper.com

GREENVALLEY

একটি সবুজ স্বপ্ন, একটি আস্থার প্রতীক।

ব্যবসায় সমৃদ্ধির

গ্রীন সীগন্যাল

স্বপ্ন এবার সত্যি হবার পালা। গ্রীনভ্যালী নিয়ে এল গ্রীনবেরী-র কর্নফ্লেক্স, ওটস্, প্যাকেজড্ ওয়াটার, জ্যাম, পিকলস্ এর রকমারি স্বাদের বিপুল সম্ভার।

আর তাই সমস্ত টীম লিডার ও নেটওয়ার্কের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য রইল গ্রীনভ্যালীতে সাদর আমন্ত্রন। সত্ত্বর যোগাযোগ করুন এবং উপভোগ করুন দীর্ঘস্থায়ী, সুনিশ্চিত ও সফলতম ভবিষ্যতের। আর সাথেসাথেই গড়ে তুলুন সম্পূর্ণ নিজস্ব অফিস যা আপনার ব্যবসায় সমৃদ্ধির সিগন্যালকে রাখবে সদাসর্বদা গ্রীন।

হেল্পলাইন ঃ (033) 6459 6452 / 3341, 90517 88800

খবর ৩৬৫ দিন-এর সঙ্গে বিনামূল্যে

রবি

২৩ সেপ্টেম্বর ২০১২ । বর্ষ ১ । সংখ্যা ৩৬

প্রচ্ছদ ৭

কাঁকড়ার জাত

শঙ্কর কুমার প্রামাণিক

গৌতমকুমার দে

গল্প ২০

নারী সেবা রত্ন
দীপঙ্কর দাস

ধারাবাহিক ২৬

মৌষলকাল
সমরেশ মজুমদার

কবিতা ৩২

অনুরাধা মহাপাত্র, সঞ্জীব নিয়োগী, শাশ্বত কর, কৌশিক বিশ্বাস, হিন্দোল ভট্টাচার্য, মাসুদ খান

নভেলেট ৩৪

বাঁচা-মরার মাঝখানে
বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়

পথে প্রবাসে ৪০

ইথিওপিয়া
অলক সান্যাল

নিয়মিত বিভাগ

আলোচনা ৪৪

উদাসী বাবার আখড়া ৪৭
ল্যাডলী মুখোপাধ্যায়

রোজ কত কী ৫০
সুব্রত সেন

প্রচ্ছদ : তাপস মণ্ডল

মুখ্য প্রকাশক **গৌতম কুণ্ডু** । সম্পাদক **পূষন গুপ্ত** । সহযোগী সম্পাদক **সুব্রত সেন**

রোজভ্যালি পত্রিকা লিমিটেড-এর পক্ষে পূষন গুপ্ত কর্তৃক ২ টেম্পল স্ট্রিট, তৃতীয় তল, কলকাতা - ৭০০ ০৭২ থেকে প্রকাশিত।
সম্পাদকীয় দফতর: সার্কুলার কোর্ট, ষষ্ঠ তল, ৮ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড, কলকাতা ৭০০ ০১৭।

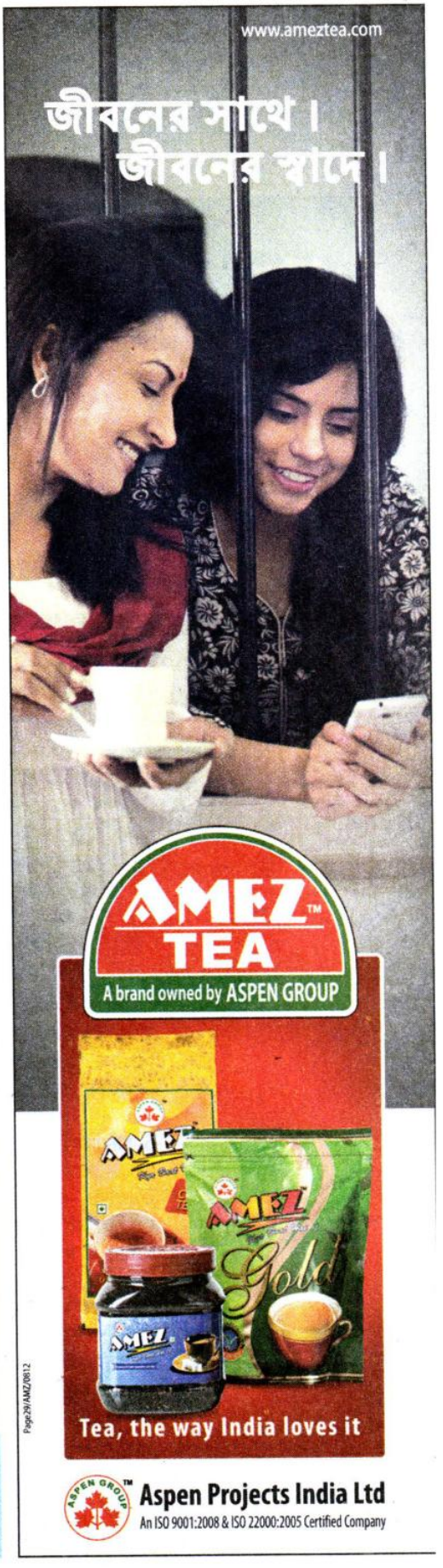

আবার সহজ পাঠ

মুদ্রণযন্ত্রে গোলযোগের কারণে 'রবি'-র ১৬ সেপ্টেম্বর, ২০১২ সংখ্যায় প্রচ্ছদ নিবন্ধে অভীক মজুমদারের সহজ পাঠ বিষয়ক লেখাটিতে ত্রুটি থেকে যায়। এর জন্য পাঠকদের কাছে আমরা ক্ষমাপ্রার্থী। পাঠকদের সুবিধার্থে লেখাটি সম্পূর্ণভাবে পুনর্মুদ্রিত হল।

এক আশ্চর্য বই

লক্ষ ক'রে দেখলেই বোঝা যায় দৃশ্য আর শ্রাব্যকে কত সুচারু মসৃণতায় মিশিয়ে দিচ্ছেন রবীন্দ্রনাথ। শিশুর মনে প্রকৃতির রঙ বেরঙের ঝিলিমিলি ঢুকে পড়ছে চোখের আর কানের মাধ্যমে, জীবন্ত প্রকৃতির রূপরস গন্ধ শব্দ শিশু গ্রহণ করছে সর্বশরীরে।

অভীক মজুমদার

'যে বয়সে ক-খ চিনলেই যথেষ্ট, সেই বয়সেই সাহিত্যরসে দীক্ষা দেয় 'সহজ পাঠ' : এই একটি বইয়ের জন্য বাঙালি শিশুর ভাগ্যকে জগতের ঈর্ষাযোগ্য বলে মনে করি।'
— বুদ্ধদেব বসু। সাহিত্যচর্চা। 'বাংলা শিশু সাহিত্য'

১. চারিদিক ঝিকমিক

জীবনে কোন বই সবচেয়ে বেশিবার পড়েছি? মনে মনে উত্তর দিই— সহজপাঠ। কেননা, বাংলা পড়ার গোড়াপত্তন হয়েছিল এই বই দিয়ে। আজও কারণে-অকারণে পড়ে চলেছি এই বই। তার সঙ্গে এঁটে উঠতে কেউ পারে? মজা অবশ্য অন্য। প্রত্যেকবার পড়ার সময় নতুন করে খুলে যায় কোনও একটা দিক, কোনও একটা পংক্তির সৌন্দর্য, কোনও একটা শব্দের তাৎপর্য কিংবা কোনও একটা কারিগরির অসামান্য কৌশল! কারিগরি? শব্দটা শুনেই চোখ পাকাবেন অনেকে, বন্দুকের নলের মতো অনেকগুলি তর্জনী আমার দিক যে উদ্যত হচ্ছে, সে দৃশ্য স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। তৎসত্ত্বেও একথা বলতে চাই, অন্য সব মাত্রা যদি সরিয়ে রাখি, শুধু কারিগরির চমকপ্রদ ব্যবহারে 'সহজ পাঠ' সবাইকে পেছনে ফেলে দেবে। এধরনের প্রাইমারে কবির কল্পনা আর দক্ষতার এমন মিশেল অসম্ভব। একটু ঝুঁকি নিয়েই বলি, বাংলা গোড়াপত্তন বই হিশেবে 'সহজ পাঠ'-এর দশ কিলোমিটারের মধ্যে এখনও কেউ আসতে পারেনি। কবে পারবে জানি না। দু-একটা দৃষ্টান্ত দিই। এবারে সব বলছি না। কণামাত্র নিয়ে আলোচনা করছি।

প্রথম ভাগ থেকে কয়েকটি পংক্তি পরপর বসাই:

ডালে ডালে কাক ডাকে। খালে বর মাছ ধরে। বেলফুল সাদা। জবাফুল লাল কিংবা পথে কত লোক চলে। ছোটো খোকা দোলা চড়ে দোলে। কত লোক খাবে। কত লোক গান গাবে। এসব 'গদ্যাংশ' পেরিয়ে কত সহজে ঢুকে পড়া যায় 'পদ্যাংশে'—

বনে বনে পাখি জাগে,/
মেঘে মেঘে রঙ লাগে।/ জলে জলে ঢেউ ওঠে/ ডালে

ডালে ফুল ফোটে।

যুক্তাক্ষরহীন পংক্তির পংক্তিতে আসলে মিশ্রকলাবৃত্তের কাঠামো তৈরি করেছেন রবি ঠাকুর। আলতো অন্ত্যানুপ্রাসের ছোঁয়ায় তাকে এবার নিয়ে যাচ্ছেন কবিতার অঙ্গনে। শিশু শিক্ষার্থী ছন্দের দোলায় অভ্যস্ত করে নিচ্ছে তার কান। গদ্য থেকে ক্রমে পদ্যে।

'দ্বিতীয় ভাগ' সহজপাঠের একেবারে গোড়ায় চোখ রাখা যাক। 'বাদল করেছে। মেঘের রং ঘন নীল। ঢং ঢং ক'রে নটা বাজল।'

আবার কবিতায়, 'সেদিন ভোরে দেখি উঠে/ বৃষ্টি বাদল গেছে ছুটে/রোদ উঠেছে ঝিলমিলিয়ে/ বাঁশের ডালে ডালে। /ছুটির দিনে কেমন সুরে/ পুজোর সানাই বাজায় দূরে/ তিনটে শালিখ ঝগড়া করে/ রান্নাঘরের চালে।'

লক্ষ ক'রে দেখলেই বোঝা যায় দৃশ্য আর শ্রাব্যকে কত সুচারু মসৃণতায় মিশিয়ে দিচ্ছেন রবীন্দ্রনাথ। শিশুর মনে প্রকৃতির রঙ বেরঙের ঝিলিমিলি ঢুকে পড়ছে চোখের আর কানের মাধ্যমে, জীবন্ত প্রকৃতির রূপরস গন্ধ শব্দ শিশু গ্রহণ করছে সর্বশরীরে। বিকাশ আর পূর্ণতার এই ইন্দ্রিয় নির্ভর বিস্তারকে স্বীকৃতি জানাতেই গানে তিনি জানিয়েছিলেন,

'নয়ন আমার রূপের পুরে/ সাধ মিটায়ে বেড়ায় ঘুরে
শ্রবণ আমার গভীর সুরে হয়েছে মগন...'।

পাঠ্য বই হিসেবে সহজ পাঠ যেমন ছিল

জগতে আনন্দযজ্ঞে অংশ নিতে শেখানোর বই 'সহজ পাঠ'। কৃশ এর আকার। কিন্তু চমকপ্রদ আর অকল্পনীয়ের এখানে নিত্য আসা যাওয়া। বিশ্বভরা প্রাণকে শিশুমনে স্থায়ী আসন পেতে দিতেই প্রথম ভাগ আর দ্বিতীয়ভাগে এত সমাসোক্তি অলঙ্কারের প্রয়োগ। বিপুল তরঙ্গ রে...।

২. একদিন যারা মেরেছিল তারে গিয়ে

শিক্ষাদপ্তরে বিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচি। পাঠ্যপুস্তক নিয়ে কাজ করতে শুরু করার পর হাতে আসে সরকারি 'সহজ পাঠ'। এটা ২০১১ সালের কথা। চমকে উঠি সে বই দেখে। খর্ব, বিকলাঙ্গ, বিকৃত এই 'সহজ পাঠ' এখন সরকারিভাবে পাঠ্য? উত্তর আসে, হ্যাঁ—এ বই তো অনেকদিন চলছে। এই চেহারায়? আবার উত্তর আসে, হ্যাঁ। বই খুলে আরো 'চমৎকৃত' হই। 'প্রথম ভাগ'—এর শেষ কবিতা 'কতদিন ভাবে ফুল উড়ে যাব করে'— আমাদের চেনা বিশ্বভারতীর রবীন্দ্রকৃত সংস্করণে আছে দেড়পাতা জুড়ে। সরকারি 'সহজ পাঠ'-এ আকার খর্ব করার কারণেই সেই কবিতা এক পৃষ্ঠায় ঠেসেঠুসে ঢোকানো। রবীন্দ্রনাথের পরিকল্পিত অবয়বে বা রবীন্দ্ররচনার গায়ে হাত দিলেন কোন মার্কসবাদী পন্ডিত? উত্তর মেলে না। কার সিদ্ধান্তে ছেঁটে ফেলা হল পুরোনো অবয়ব? উত্তর মেলে না। কে কোন অধিকারে রবীন্দ্রনাথের বিন্যাসে পরিবর্তন আনলেন? উত্তর

রবীন্দ্রনাথের পরিকল্পিত অবয়বে বা রবীন্দ্ররচনার গায়ে হাত দিলেন কোন মার্কসবাদী পন্ডিত? উত্তর মেলে না। কার সিদ্ধান্তে ছেঁটে ফেলা হল পুরোনো অবয়ব?

বিশ্বভারতী প্রকাশন মুদ্রিত সহজ পাঠ

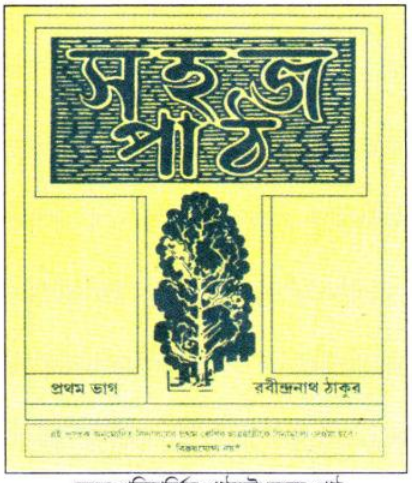

নতুন পরিমার্জিত পাঠ্যবই সহজ পাঠ

মেলে না।

প্রশ্নগুলি এবার সরাসরি করে ফেলি। 'সহজ পাঠ'-এর এই বিকৃত সংস্করণের দায়িত্ব কে নিচ্ছেন জানতে চাই। বহুবার এই প্রশ্ন সংবাদমাধ্যমেও করেছি কিন্তু উত্তর পাইনি। আসলে, রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে গত জামানার 'বাম' নেতৃবর্গের একটা তাচ্ছিল্য এবং অবমাননা সূচক মনোভাব আছে। যে কারণে 'বুর্জোয়া' এই কবির সমগ্র রচনাবলির 'সামান্য নির্বাচিত' অংশই যে পাঠ্য সেকথা লিখিত বা মৌখিকভাবে এঁরা জানিয়ে এসেছেন। 'সহজ পাঠ' সম্পর্কে একই মনোভাব তাঁরা বজায় রেখেছেন মাত্র। 'সহজ পাঠ'-এর আকার-বিন্যাস পালটে গেলে তাঁদের খুব কিছু আসে যায় না। এত লক্ষ কপি ছাপা হল সেই খর্বাকৃতি 'সহজ পাঠ', পশ্চিমবঙ্গের কোণে কোণে ছড়িয়ে গেল সেই বই অথচ নজরে এল না কোনও 'বামপন্থী' শিক্ষকনেতার, শিক্ষাবিদ বা শিক্ষা তাত্ত্বিকের? তদনীন্তন শিক্ষামন্ত্রী বা মুখ্যমন্ত্রীরাও কি দেখেননি? এ কথা মানা শক্ত। অসম্ভবও তেমন ঘটনা। তাহলে? আসলে, 'সহজ পাঠ'-এ রবীন্দ্র পরিকল্পনার বিষয়টিকেই তাঁরা অনুধাবন করতে চাননি কোনওদিন। একেই বলছি, তাচ্ছিল্য আর অবমাননাকর দৃষ্টিভঙ্গি।

খর্বাকৃতি 'সহজ পাঠ', পশ্চিমবঙ্গের কোণে কোণে ছড়িয়ে গেল সেই বই অথচ নজরে এল না কোনও 'বামপন্থী' শিক্ষকনেতার, শিক্ষাবিদ বা শিক্ষা তাত্ত্বিকের?

সহজপাঠ-এর অবয়ব নিয়ে কিছু সাবধানবাণী কি উচ্চারণ করে গেছেন রবীন্দ্রনাথ? 'সহজ পাঠের ছবির সাইজ ব্যয়সংক্ষেপের খাতিরে খর্ব করতে চাও এ প্রস্তাবে নন্দলাল দুঃখিত। সেই একই কারণেই তোমরা আমার লেখাকে ছেঁটে বইয়ের আয়তন ও মূল্য কমাতে পারতে। কিন্তু সেটা আমার পক্ষে প্রীতিকর হত না।' (প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশকে চিঠি। দেশ ২৭ আষাঢ় ১৩৮২। পৃ ৮১৪)

আমার মাঝে মাঝে সন্দেহ হয়, এ কি প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশকেই লেখা, নাকি তাঁর মৃত্যুর বহুদশক পরে বঙ্গরাজ্যের শাসনকর্তাদের উদ্দেশে লেখা?

অত্যন্ত আনন্দের কথা, ২০১৩ শিক্ষাবর্ষে নতুন পশ্চিমবঙ্গ সরকার রাজ্যের অগনিত ছাত্রছাত্রীর হাতে যে সহজপাঠ প্রথম ও দ্বিতীয়ভাগ তুলে দেবে, তা রবীন্দ্র পরিকল্পিত পুরোনো অবয়ব। আমার নিজের সন্তান যে বিশ্বভারতী সংস্করণ পড়েছে, তারই নিখুঁত প্রতিফলন হবে এবারের বই।

'সহজ পাঠ' ঘিরে বিতর্কের অবশ্য আরও দীর্ঘ ইতিহাস আছে। আটের দশকের একেবারে গোড়ায় বামফ্রন্ট সরকার 'সহজ পাঠ' বইটিকে 'অবৈজ্ঞানিক' এবং 'পাঠোপযোগী নয়' বলে চিহ্নিত করে। এ কথাও পাশাপাশি বলা হয় যে, 'শ্রেণি সংগ্রাম' এবং 'শ্রেণি বিভাজন' সম্পর্কে বই দুটির দৃষ্টিভঙ্গি 'প্রতিক্রিয়াশীল'। বইটি পাঠ্যতালিকা থেকে বর্জিতও হয়। পরে 'দ্বিতীয় পুস্তক' হিসেবে ফেরত আনা হয়। প্রধান গুরুত্ব দেওয়া হয় বিবর্ণ, মলিন, সাহিত্যগুণে নিম্নস্তরের 'কিশলয়'-কে। পাঠ্যপুস্তকের 'রাজনীতিকরণ'-এর এর চেয়ে বড়ো উদাহরণ কী হতে পারে? পাঠ্যপুস্তক 'শ্রেণিসংগ্রাম'-এর হাতিয়ার? মগজ ধোলাইয়ের? ক্যাডার বানানোর কাস্তে-হাতুড়ি?

অনেক 'বামপন্থী' শিক্ষকনেতা, বুদ্ধিজীবী, লেখক-এই পুরো ইতিহাসটিকেই ইদানীং নানা সংবাদমাধ্যমে অস্বীকার করতে চাইছেন, কেন না তাঁরা সত্য উদ্‌ঘাটনে ভয় পান। কোনদিন শুনবো বামফ্রন্ট সরকার প্রাথমিকে ইংরেজি কখনও তুলেই দেয় নি। মরিচঝাঁপি থেকে নন্দীগ্রাম সবই সমালোচকদের 'ভৌগোলিক ভুল'।

৩. শরতের আকাশেতে সোনা রোদ্দুরে

'সহজ পাঠ' এক আশ্চর্য বই। প্রথমভাগ আর দ্বিতীয়ভাগ মিলিয়ে ১৯৩০ সালে প্রকাশিত এই প্রাইমারে আধুনিক শিক্ষাদর্শের প্রতিফলন খুঁজে পাওয়া যাবে পাতায়-পাতায়। সময়ের অগ্রজ যেন রবীন্দ্রনাথ। প্রকৃতি আর শিশুমনের সংযোগ, ছবি আর লেখার বাইরেও পাতায় প্রচুর স্পেস, কর্মচঞ্চল বিশ্ব আর শিশুবিকাশের সেতুবন্ধ, শিশুজগতের সারল্য আর রহস্য সবই জাগ্রত রয়েছে এখানে। সারল্য আর রহস্য সবই জাগ্রত রয়েছে এখানে। সর্বাধুনিক শিক্ষাতত্ত্ব এই প্রসঙ্গগুলিকেই গুরুত্ব দেয়। সহজ পাঠ-কে কেন্দ্রে রেখে নতুন সরকারের উদ্যোগে তৈরি হয়েছে সমন্বিত এক পাঠ্যপুস্তক 'আমার বই'। এ বইও শিশুশিক্ষার্থীদের হাতে পৌঁছবে ২০১৩ সালের নতুন শিক্ষাবর্ষে। রাজ্যের শিশুদের কাছে সে বই কতটা আনন্দময় হয় তা দেখার জন্য আমরা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি। ❖

কাঁকড়ার জাত

কাঁকড়া এমন একটি জাতি যারা নিজেদের ক্ষিদে মেটানোর জন্য নিজের ফ্যামিলির বউ-বাচ্চা-বাপ-মাকেও রেয়াত করে না। এই প্রাণীকুল বিলকুল স্বজাতি-ভক্ষক। এই রাজ্যের সুন্দরবনেই কম করে ১১ প্রজাতির কাঁকড়া পাওয়া যায়। এছাড়া আরও একটি বিশেষ কর্কটজাতি আছে। তার নাম বাঙালি। হ্যাঁ, বাঙালিও নাকি আরেক কাঁকড়ার জাত। নিজের স্বজাতিকে টেনে নামাতে তার জুড়ি নেই। কাঁকড়ার মতোই এক ঝুড়ি বাঙালি রেখে দিলে কেউ ঝুড়ি টপকে পালাতে পারবে না। অন্যরা ঠিক ঠ্যাং ধরে নামাবেই। এ সব হয়ত নিন্দুকদের অপবাদ। সে যাকগে, গোটা বিশ্বের কাছে এক আশ্চর্য সম্পদ সুন্দরবনের কাঁকড়া এবং কাঁকড়া শিকারিদের অদ্ভুত জীবন। সঙ্গে বাঙালি কাঁকড়ার কীর্তি। এই নিয়েই এবারের প্রচ্ছদ।

সুন্দববনের কাঁকড়া ও শিকারি

শঙ্কর কুমার প্রামাণিক

এই মুহূর্তে গোটা পৃথিবীর খাদ্যরসিকদের মধ্যে রসনাতৃপ্তির এক অন্যতম ব্যঞ্জন হল সুন্দরবনের কাঁকড়া। আর এই কাঁকড়া যারা ধরে সেই শিকারিদের জীবনও কিন্তু ভারী বৈচিত্র্যময়। প্রায় ১৫০টার বেশি গ্রামে ত্রিশ হাজারের বেশি মানুষ এই পেশায় যুক্ত। দৈনন্দিন অভাব আর হতাশাকে পাশে সরিয়ে রেখে, বেঁচে থাকার লড়াইয়ে মানুষগুলি সঙ্গী করেছে এই কাঁকড়াদের। আর কর্কট খোলসের মতই কঠিন এদের শিকার পদ্ধতিও।

খাওয়ার উপযোগী কাঁকড়াদের মধ্যে নোনা বা সমুদ্র কাঁকড়ার অর্থনৈতিক গুরুত্ব সবচেয়ে বেশি। এর বৈজ্ঞানিক নাম স্কাইলা সেরেটা। নোনা বা সমুদ্র কাঁকড়া আকারে সবচেয়ে বড়। দৈর্ঘ্যে ১৮০ মিমি এবং ওজনে দু'কেজি পর্যন্ত হয়। তবে গড়পড়তা ৩০০ থেকে ৫০০ গ্রাম ওজনের নোনা কাঁকড়া রফতানি হচ্ছে। এখন সুন্দরবন থেকে ২০০ গ্রামের কম ওজনের কাঁকড়াও বিদেশে যাচ্ছে।

উদরের ঢাকনা দেখে মেয়ে/পুরুষ কাঁকড়া চেনা যায়। পুরুষ কাঁকড়ার উদরের ঢাকনা সরু ও ত্রিকোণাকৃতি। আর মেয়ে কাঁকড়ার উদরের ঢাকনা চওড়া ও অর্ধবৃত্তাকার। পরিণত মেয়ে কাঁকড়া সমুদ্রে পাড়ি দেয় ডিম ছাড়ার জন্য। একটা ডিমওয়ালা মেয়ে কাঁকড়া ১০ থেকে ৮০ লক্ষ ডিম বহন করে। কাঁকড়ার পাঁচজোড়া পা আছে। ওই পায়ের সাহায্যে তারা হাঁটে, সাঁতার কাটে, গাছে চড়ে এবং গর্ত খোঁড়ে। একটা কাঁকড়া যখন গর্ত বানায়, তখন সেই গর্তের মুখের ব্যাস তার খোলকের দেড়গুণ হয়। আর কাঁকড়া যতটা পুরু হয়, গর্তটা তার দ্বিগুণ চওড়া হয়। কাঁকড়া তার মাপমতো গর্ত বানায়। সেই গর্তে লুকিয়ে থাকে, খোলক ছাড়ে, প্রজননক্রিয়া সম্পন্ন করে।

স্ত্রী কাঁকড়ার সঙ্গমোপযগী হয়ে ওঠা নির্ভর করে তার ডিম্বাণু তৈরির ওপর। তখন তার ওজন হয়ে যায় ১৫০ গ্রাম বা তার একটু বেশি। পরিণত পুরুষ কাঁকড়া

মিলনের আগে প্রজননক্ষম স্ত্রী কাঁকড়ার প্রতি আকৃষ্ট হয় একটা বিশেষ সময়ে। সেই সময়টা হল স্ত্রী কাঁকড়ার খোলক ত্যাগের দু'তিন দিন আগে। এই সময়টাতে পুরুষ কাঁকড়া তার সঙ্গীর কাছছাড়া হয় না। গর্তের মধ্যেই দু'জনে থাকে। খোলক ত্যাগ করার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত তাকে বুকে করে আগলে রাখে। এই সময় স্ত্রী কাঁকড়া নিষ্ক্রিয় থাকলেও, পুরুষ কাঁকড়া সক্রিয় থাকে। পুরুষ কাঁকড়া যখন তার সঙ্গিনীকে সোহাগ করে, তখন কোনও আগন্তুক কাঁকড়াকে তার ধারেকাছে ঘেঁষতে দেয় না। পুরুষ কাঁকড়া স্ত্রী কাঁকড়ার খোলক ত্যাগে সাহায্য করে। খোলক ত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে তাদের যৌনমিলন শুরু হয়। পুরুষ কাঁকড়া তার পায়ের সাহায্যে স্ত্রী কাঁকড়ার তলপেটের ওপর থেকে উদরখণ্ডের ঢাকনাটা খুলতে সাহায্য করে। তারপর পুরুষ কাঁকড়া তার শুক্রাণু স্ত্রী কাঁকড়ার ডিম্বনালিতে প্রবেশ করায়। কাঁকড়ার সঙ্গম ৫-৬ ঘণ্টা স্থায়ী হয়। সঙ্গমের পরেও পুরুষ কাঁকড়া স্ত্রী কাঁকড়াকে পাহারা দেয়, যতক্ষণ পর্যন্ত তার খোলক কিছুটা শক্ত না হয়। সুন্দরবনের কাঁকড়ামারাদের মতে কাঁকড়ার প্রজননের উপযুক্ত সময় হল বর্ষাকাল (আষাঢ়, শ্রাবণ ও ভাদ্র) এবং শীতকাল (অগ্রহায়ণ, পৌষ ও মাঘ)। সমুদ্র কাঁকড়া হল একগামী। সুন্দরবনের কাঁকড়া শিকারিরা বলেন, একটা মাদি কাঁকড়া একাধিক মদ্দা কাঁকড়ার সঙ্গে ঘর করে না। আবার একটা মদ্দা কাঁকড়া তার নির্দিষ্ট সঙ্গিনী ছাড়া অন্য কারও সঙ্গে মিলিত হয় না। তাই কাঁকড়াকে বলা হয় বিশ্বস্ত দাম্পত্য জীবনের প্রতীক। কাঁকড়া সর্বভুক। এমনকী এরা স্বজাতি ভক্ষক। এদের বেশি পছন্দ মাছ, কাঁকড়া, চিংড়ি এবং ওই জাতীয় বিভিন্ন জলজ প্রাণী। ঝিনুক, শামুক, গুগলি ইত্যাদিও কাঁকড়ার খাদ্য। জলের মধ্যে মৃত প্রাণীর পচাগলা দেহও বাদ দেয় না। সমুদ্র বা নোনা কাঁকড়া পচনশীল যে কোনও প্রাণীকে খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে। কাঁকড়া এই সমস্ত পদার্থ খেয়ে খাল, বিল, খাঁড়ি, নদীনালার জলের দূষণ রোধ করে। এরা পরিবেশকে দূষণমুক্ত রাখতে সাহায্য করে। সেই অর্থে কাঁকড়াকে লবণাক্ত জলের ঝাড়ুদার প্রাণী বলা যায়। কাঁকড়া সুন্দরবনের বাঘ, বন্য শুয়োর, শিয়াল, বানর, কুমির প্রভৃতি প্রাণীর উপাদেয় খাদ্য। সুন্দরবনের কাঁকড়া নির্বিচারে ধরা বা ধ্বংস করা হতে থাকলে খাদ্য শৃঙ্খলের ওপর গভীর প্রভাব পড়বে। বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্যে ব্যাঘাত ঘটবে।

কাঁকড়া শিকারের সরঞ্জাম

সুন্দরবনের কাঁকড়া শিকারিরা যে সরঞ্জাম ব্যবহার করেন, সেগুলো অতি সাধারণ, সেকেলে এবং দামে সস্তা। কিন্তু কার্যকর এবং পরিবেশবন্ধু। প্রধান প্রধান সরঞ্জাম হল যন্ত্রবিহীন ছোট ছোট দেশি ডিঙি/নৌকো, শিক, দোন, খোন্তা, খোটাবাড়ি, কোদাল, চিমটে, খাঁচা, নানা সহজের ঝাঁকা, সিন্থেটিক ব্যাগ (খাঁচার পরিবর্তে)। এ ছাড়া কাঁকড়া শিকারিরা নৌকোতে প্লাস্টিকের জ্যারিকেন, খালি মুড়ির টিন, পলিথিনের ড্রাম, লোহার সাঁড়াশি, দা, ছুরি ইত্যাদি রাখেন। দোনের কাঁকড়া শিকারিদের খ্যাপা জাল, পাটা জাল, খ্যাগলা জাল, কাঁটা দোন ইত্যাদি নৌকোতে রাখতে হয়। জালের সাহায্যে মাছ ধরে সেই মাছগুলোকে কাঁটা দোনের টোপ হিসেবে ব্যবহার করা হয়। কাঁটা দোনে যে মাছ পাওয়া যায়, সেগুলো দিয়ে কাঁকড়ার টোপ বা চারা তৈরি হয়।

কাঁকড়া শিকারিদের দল গঠন

সুন্দরবনের কাঁকড়া শিকারিরা সুন্দরবনের জল ও জঙ্গল থেকে

যাত্রা শুরুর আগে কাঁকড়া শিকারিরা নিজেরা দল গঠন করেন। কাঁকড়া শিকারিদের দলে মহিলারাও থাকেন। দুজনকে নিয়েও দল গঠন করা যায়।

ছবি: লেখক

কাঁকড়া শিকারিরা যাঁরা শিকে কাঁকড়া ধরেন, তাঁরা নৌকোকে জঙ্গলের ধারে নদীতে অথবা খাঁড়িতে নোঙর করে রেখে জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ করেন।

শিক ও দোনের সাহায্যে কাঁকড়া ধরেন। কাঁকড়া শিকারে তাঁরা ছোট নৌকো বা ডিঙি ব্যবহার করেন। যাত্রা শুরুর আগে কাঁকড়া শিকারিরা নিজেরা দল গঠন করেন। কাঁকড়া শিকারিদের দলে মহিলারাও থাকেন। দু'জনকে নিয়েও দল গঠন করা যায়। নামখানা থানায় পূর্বদ্বারিক নগরে অনেক কাঁকড়া শিকারি দু'জনের দল গঠন করে কাঁকড়া ধরতে যাচ্ছেন। যে কাঁকড়া শিকারির নিজের ডিঙি আছে, তিনি নিজের পরিবারের একজনকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে পড়ছেন। যাঁর পক্ষে পরিবারের কাউকে সঙ্গে নেওয়া সম্ভব নয়, তিনি পাড়া-প্রতিবেশীদের মধ্যে থেকে একজনকে ভাগী হিসেবে নিয়ে যান। আবার অনেকে আছেন, যাঁরা নিজেদের স্ত্রীকে সহযোগী হিসেবে নিয়ে যান। পূর্বদ্বারিক নগরের জগদীশ পণ্ডিত (৭২) এখন আর কাঁকড়া ধরতে যান না। তাঁর দুই ছেলে— অনাদি (৩৫) আর অরুণ (২৭) নিজেদের দুটো নৌকা নিয়ে স্ত্রীদের সহযোগী করে কাঁকড়া ধরতে যাচ্ছেন। তাঁরা দোনের সাহায্যে ঠাকুরন নদী, সপ্তমুখী নদী এবং বিভিন্ন জঙ্গলের মধ্যে খাঁড়িতে কাঁকড়া ধরেন। একটানা পাঁচ-ছয় দিন। দ্বিতীয়া থেকে ষষ্ঠী আবার দশমী থেকে চতুর্দশী। অনাদি আর অরুণ যখন সস্ত্রীক নদীতে থাকেন, তখন জগদীশ পণ্ডিত ও তাঁর স্ত্রী নাতিনাতনিদের দেখাশোনা করেন। বাবা-মায়ের খাওয়া-পরার খরচখরচা ছেলেরাই বহন করেন। তিনজনের দল গঠন করে দোনে কাঁকড়া ধরতে যাওয়ার খুব বেশি রেওয়াজ আছে গোসবা, ছোট মোল্লাখালি, সাতজেলিয়া, হেঁতালবাড়ি, কালিদাসপুর প্রভৃতি অঞ্চলে। নিত্যানন্দ সরকার (৪৬), গ্রাম: হেঁতালবাড়ি, থানা: গোসবা, ৩০ বছর দোনে কাঁকড়া ধরছেন। নিজের একটা ডিঙি আছে। নিত্যানন্দবাবুর দুই ছেলে— রামপদ (২৪) ও বুদ্ধদেব (২১)। নিত্যানন্দবাবু দুই ছেলেকে নিয়ে কাঁকড়া ধরতে যান। বাইরের কারও সাহায্য লাগে না। গোলাম রসুল গাজি (৩৫), সাতজেলিয়া, গোসবা থানা। পনেরো-ষোলো বছর বয়স থেকে কাঁকড়া ধরছেন। বাবাও ধরতেন। চাঁদখালি জঙ্গলে কাঁকড়া ধরতে গিয়ে বাঘের আক্রমণে মারা যান। গোলামের নিজের নৌকা নেই। গোলামের সঙ্গে আছেন আরও দু'জন— অনাথ কয়াল (৪০) আর অরুণ মণ্ডল (৩৭)। নৌকোর মালিক অনাথ কয়াল। তিনি নৌকোর জন্যে একটা ভাগ পান। গোলাম কাঁকড়া ধরলেও নিজে কখনও কাঁকড়া খান না। তাঁর দুই সহযোগীও নৌকোতে কাঁকড়া খাওয়া ত্যাগ করেছেন।

কাঁকড়া ধরার পদ্ধতি

কাঁকড়া শিকারিরা ছোট ছোট নৌকোতে করে নির্দিষ্ট জায়গাতে পৌঁছে শিকে ও দোনে কাঁকড়া শিকার করেন। যাঁরা শিকে কাঁকড়া ধরেন, তাঁরা নৌকোকে জঙ্গলের ধারে নদীতে অথবা খাঁড়িতে নোঙর করে রেখে জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ করেন। শিককে

ফটিকপুরের কাঁকড়া মারারা কাঁপি, পাথরপ্রতিমা থানার শবররা আংড়ি বলেন। শিক বা কাঁপির একদিক একটু বাঁকানো থাকে। ইংরেজি 'জে' অক্ষরের মতো, অপরদিকে থাকে কাঠের হাতল। জঙ্গলে নেমে দলের সকলে কাঁকড়ার গর্তের সন্ধান করতে থাকেন। গর্তের দেখা মিললে শিকারি গর্তের মধ্যে শিকটা ঢুকিয়ে দিয়ে কাঁকড়ার অবস্থান বোঝার চেষ্টা করেন। তারপর শিকের সাহায্যে গর্ত থেকে কাঁকড়াকে টেনে বের করেন। এরপর কাঁকড়াটাকে চিমটে দিয়ে ধরে খাঁচার মধ্যে রেখে দেন। কাঁকড়ার সব গর্ত এক সরলরেখায় থাকে না। সে ক্ষেত্রে গর্তকে কোদাল, খোন্তা অথবা খোটাবাড়ির সাহায্যে বাগে আনতে হয় যাতে করে শিক দিয়ে কাঁকড়াকে গর্ত থেকে বের করা যায়। এভাবে গর্ত খুঁজে খুঁজে শিকের সাহায্যে কাঁকড়া ধরা চলতে থাকে। অভিজ্ঞ কাঁকড়া শিকারি গর্তের কাছে কাঁকড়ার পায়ের ছাপ দেখে বুঝতে পারেন গর্তের মধ্যে কাঁকড়া আছে কি নেই। গর্তের মধ্যে একটা না দু'টো কাঁকড়া আছে, তাও অনুমান করতে পারেন। গর্তের কাঁকড়ার সাইজও আঁচ করতে পারেন।

সুন্দরবনের মধ্য দিয়ে শিরা-উপশিরার মতো অসংখ্য শাখা-উপশাখা নদী প্রবাহিত। সুন্দরবনের কাঁকড়া শিকারিরা এই সমস্ত শাখা-উপশাখা নদীতে এবং অসংখ্য খাঁড়িতে দোন পেতে কাঁকড়া ধরেন। সুন্দরবনের বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন দৈর্ঘ্যের দোন ব্যবহৃত হয়। গোসবা থানার ছোট মোল্লাখালির কাঁকড়া শিকারিরা সাধারণত ১২'০০ থেকে ১৬০০ হাত লম্বা প্লাস্টিকের দড়ির তৈরি দোন ব্যবহার করেন। ১৬০০ হাত লম্বা দোনে তিন-চার হাত অন্তর অন্তর জাল কাঁটি বাঁধা হয়। এক-একটা জাল কাঁটির ওজন প্রায় কুড়ি গ্রাম। দোনেতে এত ঘন ঘন জাল কাঁটি বাঁধার কারণ, দোনটা যাতে মাটি ছুঁয়ে থাকে। নামখানা থানার কাঁকড়া শিকারিরা জাল কাঁটির পরিবর্তে ৫০ হাত অন্তর অন্তর ১০০ থেকে ১৫০ গ্রাম ওজনের ইটের টুকরো বাঁধেন। গোসবা থানার কাঁকড়ামারারা কাঁকড়ার টোপকে (খাবার) চালা বলেন। ১৬০০ হাত লম্বা দোনে তাঁরা দুই-আড়াই হাত অন্তর অন্তর চারা (কাঁকড়ার খাবার) বাঁধেন। ৭-৮ ইঞ্চি লম্বা সিন্থেটিকের সরু দড়িতে চারাগুলোতে আগে বেঁধে নেওয়া হয়। ৭-৮ ইঞ্চি সরু দড়ির টুকরোকে 'ছা' দড়ি বলে। ১৬০০ হাত লম্বা কাঁকড়ার দোনে চারা বাঁধতে ৪ থেকে ৫ কেজি কাঁচা মাছ লাগে। এই মাছটা যাতে কিনতে না হয়, তার জন্য কাঁকড়া শিকারিরা একটা করে কাঁটা দোন নেন। কাঁকড়ার চারার মাছ কাঁটা দোন ফেলে ধরেন। কাঁটা দোনে কাঁকড়ামারারা যেসব মাছ ধরে চারা হিসেবে ব্যবহার করেন, সেগুলো হল সাদা কুচে, সাতহেতে, তিলেবান, গাগরা মাছ প্রভৃতি। কিছু কিছু মাছ যেগুলো আগে চারা হিসেবে ব্যবহৃত হত, এখন সেগুলো ধরা সরকার নিষিদ্ধ করে দিয়েছে। সেগুলো হল সোনাবাস, বুড়ো মাছ, ফ্যামোট, মুরুলি। মাছের অভাবে কোথাও কোথাও ব্যাং ব্যবহার করছে। কাঁকড়া শিকারিরা এই মাছগুলোকে, একান্ত বাধ্য না হলে, সরকারি চারা হিসেবে ব্যবহার করেন না। মাছগুলোকে টুকরো টুকরো করে কেটে একটা পাত্রের মধ্যে নুন দিয়ে জারিয়ে নেওয়া হয়। এর ফলে মাছের পচনশীলতা রোধ করার ক্ষমতা বাড়ে।

দোনের এক প্রান্তে একটা আধলা ইট বাঁধা থাকে। অপর প্রান্তে একটা পলিথিনের বল বাঁধা থাকে। ভাসমান পলিথিনের বল দেখে দোনের অবস্থান বোঝা যায়। যখন কাঁকড়া শিকারিদের দলে তিনজন থাকেন, একজন ডিঙি বা নৌকোর হাল ধরে থাকেন, আর একজন দোনটাকে জলে ফেলতে থাকেন। ডিঙিটা এগুতে থাকে। এইভাবে পুরো দোনটা ফেলা হয়ে গেলে কাঁকড়ামারারা ২০/২৫ মিনিট অপেক্ষা করেন। তারপর দোন তুলতে থাকেন। একজন ডিঙি বাইতে থাকেন, আর একজন দোন তুলতে থাকেন। তৃতীয় ব্যক্তি হাতলওয়ালা ছোট জাল (খ্যাপা জাল) নিয়ে দোনের পাশেই বসে থাকেন। আর দোনে কাঁকড়া দেখতে পেলেই জাল দিয়ে কাটিয়ে কাঁকড়া নৌকোয় তোলেন। যখন ডিঙিতে মাত্র দু'জন থাকেন, তখন একজন হাল ধরেন, অন্যজন দোন ফেলেন এবং তোলেন। দোনে কাঁকড়া দেখতে পেলে, বাঁ হাতে দোনটা ধরে পাশে রাখা খ্যাপা জাল দিয়ে ডান হাতে কাঁকড়া কাটিয়ে নিয়ে ডিঙিতে তোলেন।

ছবি: লেখক

গর্তের দেখা মিললে শিকারি গর্তের মধ্যে শিকটা ঢুকিয়ে দিয়ে কাঁকড়ার অবস্থান বোঝার চেষ্টা করেন। তারপর শিকের সাহায্যে গর্ত থেকে কাঁকড়াকে টেনে বের করেন।

কাঁকড়ামারাদের দলে মহিলারা থাকেন। কোনও মহিলা ঋতুমতী হলে নৌকোতে তোলা হয় না। কাঁকড়ামারাদের বিশ্বাস এতে নৌকো অশুচি হয়ে যায়।

কাঁকড়া শিকারিদের সংস্কার ও বিশ্বাস

প্রত্যেক পেশার নিজস্ব পোশাগত সংস্কার ও বিশ্বাস আছে। সুন্দরবনের কাঁকড়া শিকারিদেরও আছে। কিন্তু কাঁকড়া শিকারিদের সংস্কার ও বিশ্বাসের বিশুদ্ধতা রক্ষা করা যায়নি। কারণ, কাঁকড়ামারারা নিজেরাই জল-জঙ্গলনির্ভর অন্যান্য পেশার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। কাজেই সেইসব পেশার সংস্কার ও বিশ্বাস সঙ্গত কারণেই কাঁকড়ামারাদের চিন্তাচেতনাকে প্রভাবিত করেছে। অধিকাংশ কাঁকড়া শিকারি কাঁকড়া ধরা ছাড়াও মীন ধরা, মাছ ধরা এবং মধু সংগ্রহের সঙ্গে যুক্ত। অন্যান্য পেশার সংস্কার ও বিশ্বাস সুন্দরবনের সর্বত্র কাঁকড়া শিকারিদের ওপর অবশ্য সমান প্রভাব ফেলতে পারেনি। তাই বিভিন্ন অঞ্চলের সংস্কার ও বিশ্বাসের মধ্যে একটা পার্থক্য লক্ষ করা যায়। এত সত্ত্বেও সমস্ত কাঁকড়ামারার সংস্কার ও বিশ্বাসের একটা মৌলিক সাদৃশ্য আছে।

১। কাঁকড়া শিকারিরা যাত্রা শুরুর আগে বনবিবিকে এবং নৌকোকে (কাষ্ঠদেবী) পুজো দেন।

২। এঁরা নৌকোকে এবং কাঁকড়া ধরার সরঞ্জামকে পবিত্র মনে করেন। তাই যেসব কারণে নৌকো অথবা কাঁকড়া ধরার সরঞ্জাম অশুচি হয়, সেরকম কাজ থেকে তাঁরা সর্বদা বিরত থাকেন।

৩। নৌকোতে থাকাকালীন কাঁকড়া শিকারিরা নখ কাটা, দাড়ি কাটা, চুল কাটা থেকে বিরত থাকেন। সাবান-সোডা দিয়ে জামাকাপড় কাচা নিষেধ।

৪। কাঁকড়া শিকারিরা বনবিবি ও কাষ্ঠদেবীর মতো বিশালাক্ষী ও গঙ্গাদেবীকে ভক্তিশ্রদ্ধা করেন ও পুজো দেন।

৫। আত্মরক্ষা ছাড়া অন্য কোনও কারণে বনের পশু, পাখি এমনকী বনমোরগ, বন্য শূকর, সাপ ইত্যাদি হত্যা করেন না।

৬। পুরুষরা যখন জঙ্গলে যান, তখন বাড়ির মেয়েদের মাথা আঁচড়ানো, সিঁদুর পরা, উনুনের ছাই ফেলা বারণ। সাবান-সার্ফ দিয়ে কাপড়চোপড় কাচাও বারণ। অতিথি আপ্যায়ন এবং কারওকে কিছু ধার দেওয়া নিষেধ।

৭। কাঁকড়ামারাদের দলে মহিলারা থাকেন। কোনও মহিলা ঋতুমতী হলে নৌকোতে তোলা হয় না। কাঁকড়ামারাদের বিশ্বাস, এতে নৌকো অশুচি হয়ে যায়। ওই সময় ওই মহিলাদের কাঁকড়া ধরার সরঞ্জামও স্পর্শ করা চলে না।

৮। নৌকোতে থাকাকালীন কোনও মহিলার ঋতুস্রাব শুরু হলে তাঁকে ফেরত পাঠিয়ে দেওয়া হয়। পরে নৌকোকে চান করিয়ে পুজো দিয়ে শুদ্ধ করা হয়।

পূর্বদ্বারিক নগরের কিছু কিছু কাঁকড়া শিকারি আছেন, যাঁরা স্ত্রীকে সহযোগী করে দোনে কাঁকড়া ধরতে যান এবং একটানা ৫-৬ দিন নৌকোতে কাটান। একাধিক দম্পতি জানিয়েছেন যে নৌকোতে কখনও তাঁদের শারীরিক মিলন ঘটেনি। তাঁদের বিশ্বাস, গঙ্গাদেবীর বুকে, কাষ্ঠদেবীর নৌকোয় এ 'পাপ' কাজ করলে আর রক্ষে নেই। কখনও কখনও কামনায় পীড়িত হয়ে নৌকো নিয়ে বাড়িতে ফিরে এসেছেন, কিন্তু নৌকোকে অশুচি করেননি। সুন্দরবনের অনেক জায়গা থেকে মহিলারা পুরুষের সঙ্গে নৌকোতে যান। একই জঙ্গলে শিকে কাঁকড়া ধরেন। একই নৌকোতে যাতায়াত, খাওয়া, বসা, শোয়া, তবুও কোনও অশালীন ঘটনার খবর শোনা যায়নি। কারণ কাঁকড়া শিকারিরা বিশ্বাস করেন জল-জঙ্গলে, ডাঙায় কিংবা নৌকোয় সর্বত্রই গঙ্গা,

বিশালাক্ষী, বনবিবি প্রহরায় থাকেন। কোথাও 'পাপ' করার উপায় নেই।

পাথরপ্রতিমা থানার সত্যদাসপুর আদিবাসী পাড়া ও পশ্চিম দ্বারিকাপুর আদিবাসী পল্লির কাবররা জঙ্গলে ঢুকে প্রথমেই তাঁদের ইষ্টদেবতার উদ্দেশ্যে পুজো দেন। তারপর তাঁরা কাঁকড়া ধরা অথবা মধু ভাঙা শুরু করেন। একটা গাছের গোড়ায় তিনটে ছোট ছোট কাদার তাল বসানো হয়। এই তিনটে তাল তিন দেবতা (ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর)-র প্রতীক। এই পুজোয় যে সমস্ত উপকরণ লাগে, সেগুলো হল সিঁদুর, আলতা, তেল, গামছা (কাপড়ের পরিবর্তে), মালা, ঘুনসি, আয়না, চিরুনি, ছোট ঝুড়ি, শাঁখা, লোহার বালা, ফুলের মালা, ভিজে ছোলা, চিঁড়ে, বাতাসা, সন্দেশ ইত্যাদি। আর লাগে একটা মোরগ। শবররাই নিজেরা পুজো করেন। পুজো হয়ে গেলে মোরগকে প্রসাদ খেতে দেওয়া হয়। মোরগ প্রসাদ না খেলে শবররা জঙ্গলে প্রবেশ করেন না। তাঁদের বিশ্বাস, ইষ্টদেবতা জঙ্গলে ঢোকার অনুমতি দেননি বলে মোরগ প্রসাদ খায়নি। সে ক্ষেত্রে অনুমতি না পাওয়ায় শবরদের হয় ফিরে যেতে হয়, নচেৎ ইষ্টদেবতার কাছে কান্নাকাটি, অনুনয়-বিনয় করে তাঁর অনুমতি আদায় করতে হয়। এবং লক্ষ রাখতে হয় মোরগ প্রসাদ খেল কি না। খেলে বুঝতে হবে ইষ্টদেবতা সন্তুষ্ট হয়ে জঙ্গলে প্রবেশ করার অনুমতি দিয়েছেন। শবরদের বিশ্বাস, ইষ্টদেবতার বিনা অনুমতিতে জঙ্গলে প্রবেশ করলে বিপদ অনিবার্য।

বর্তমানে সুন্দরবনে নোনা কাঁকড়ার মোট উৎপাদন কত, সঠিকভাবে জানা না থাকলেও মাথাপিছু কাঁকড়ার উৎপাদন যে কমের দিকে, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। বিভিন্ন অঞ্চলের কাঁকড়া শিকারিদের সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে বিস্তারিত আলোচনায় সেটা পরিষ্কার।

১। দীর্ঘদিন যেসব জঙ্গলে কাঁকড়া ধরা হয়েছে, গত কয়েক বছর থেকে সেখানে কাঁকড়া আর পাওয়া যাচ্ছে না। কাঁকড়ামারারা এখন সেইসব জঙ্গল পরিত্যাগ করে দূরবর্তী জঙ্গলে যেতে বাধ্য হচ্ছেন।

২। কয়েক বছর আগে যে সাইজের কাঁকড়া পাওয়া যেত, এখন আর সেই সাইজের কাঁকড়া মেলে না। বর্তমানে যা কাঁকড়া ধরা পড়ছে, তার মধ্যে মেয়ে কাঁকড়ার অনুপাত অনেক কম।

৩। বিদেশি ক্রেতাদের খিদে মেটাতে রফতানিকারী সংস্থাগুলো একশো গ্রাম ওজনের কাঁকড়াও ভালো দাম দিয়ে কিনে নিচ্ছে। ফলে সহজ রোজগারের আশায় কাঁকড়া শিকারির সংখ্যা ক্রমশ বেড়ে যাচ্ছে। আর সুন্দরবনের কাঁকড়ার মজুত ভাণ্ডার দ্রুত হ্রাস পাচ্ছে। একজন পুরুষ অথবা একজন মহিলা শুধুমাত্র একটা শিক নিয়ে জঙ্গল থেকে বাঁচার রসদ সংগ্রহ করে যাচ্ছেন। শুধু এই কারণেই প্রবল পরাক্রান্ত ২০০৯ সালের আইলা-ও কাঁকড়ামারাদের ঘরছাড়া করতে পারেনি। তাঁদের আয়ের উৎস শুকিয়ে যায় নি।

৪। কাঁকড়া মূল্যবান প্রাকৃতিক সম্পদ। কিন্তু এ সম্পদ অফুরন্ত নয়া, তাই অবাধ আহরণের ওপর যুক্তিসম্মত নিয়ন্ত্রণ চাই।

ছবি: লেখক

অন্যান্য দেশেও বিভিন্ন ধরনের নিয়ন্ত্রণ বলবৎ আছে। নিয়ন্ত্রণ আরোপের ক্ষেত্রেও কাঁকড়ামারাদের অভিজ্ঞতা ও পরামর্শকে মর্যাদা দেওয়া উচিত।

৫। গরিব কাঁকড়ামারাদের দুর্দশা লাঘব করতে সহজ শর্তে, স্বল্প সুদে এবং প্রয়োজনভিত্তিক ঋণ দেওয়া দরকার। এর ফলে হতদরিদ্র কাঁকড় াশিকারিদের মহাজন, মালিক অথবা আড়তদারদের ওপর থেকে নির্ভরতা কমবে।

৬। কাঁকড়া শিকারিদের বাঘের আক্রমণে/কুমিরের কামড়ে/সর্পদংশনে মৃত্যু ঘটলে তাঁদের পরিবার যাতে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ক্ষতিপূরণ পায়, সেটা নিশ্চিত করা।

৭। প্রত্যেক কাঁকড়ামারাকে, স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে অবিলম্বে পরিচয়পত্র দেওয়া দরকার। দুর্ঘটনায় নিহত কাঁকড়ামারার সঠিক পরিচয়পত্র থাকলে তাঁর পরিবারকে ক্ষতিপূরণের টাকা দেওয়া সহজ হবে।

সুন্দরবনের কাঁকড়া শিল্প পশ্চিমবঙ্গে গরিব, নিরক্ষর ও স্বল্পশিক্ষিত মানুষের কর্মসংস্থানের বিরাট সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছে। সুতরাং এই রাজ্যের, বিশেষ করে দক্ষিণবঙ্গের গরিব মানুষের জীবন ও জীবিকার স্বার্থে এই শিল্পকে টিকিয়ে রাখতে হবে। এর স্বাস্থ্যোদ্ধার করতে হবে। সে কারণে সব ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ (যেমন পরিবেশবিজ্ঞানী, জীববিজ্ঞানী, অর্থনীতিবিদ, সমাজবিজ্ঞানী ইত্যাদি)-দের পরামর্শ নিতে হবে। সুন্দরবনের কাঁকড়া শিল্প সংক্রান্ত তথ্যের বড় দুর্ভিক্ষ। এ ঘাটতি ঘোচাতে অবিলম্বে প্রয়োজনীয় তথ্যভাণ্ডার গড়ে তোলা জরুরি। প্রয়োজনীয় তথ্য না থাকলে কাঁকড়া শিল্পের উন্নয়নে কার্যকরী পরিকল্পনা তৈরি করা সম্ভব নয়।

এ ব্যাপারে রাজ্য সরকার তৎপর হলে এবং তথ্যভাণ্ডার গড়ে উঠলে সংশ্লিষ্ট বিভাগ, উপভোক্তা, উন্নয়নকর্মী, গবেষক, লেখক প্রভৃতি বিভিন্ন স্তরের মানুষ উপকৃত হবেন। এককথায়, উন্নয়নের কাজ ত্বরান্বিত হবে। ❖

‘এসো ভাই, টেনে নামাই’

আমার কথা নয়। প্রমথনাম বিশী মহাশয়ের কথা। বছর ৩০/৩৫ আগে টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউটের এক সভায় বাঙালির মোটো সম্পর্কে বলতে গিয়ে এই স্মরণীয় উক্তিটি করেন। কথাটা শুনি আমার এক দাদার কাছে। আর হুতোম তো কবেই বলে গেছেন: ‘আমাদের সহরে বড় মানুষদের মধ্যে অনেকের অরগুণ নাই বরগুণ আছে, “ভালো কত্তে পারবো না মন্দ কর্ব্বো কি দিবি তা দে।”

গৌতমকুমার দে

বাঙালি কাঁকড়ার জাত— এই আপ্তবাক্য জীবনে একবারও শোনেননি এমন বাঙালি বঙ্গে কি বহির্বঙ্গে বিরলই বটে। সেদিন বাজারে ‘বাঙালি ১২০ টাকা কেজি, বাঙালি ১২০ টাকা কেজি’ শুনে পিছন ফিরে দেখি ওটা কাঁকড়া বিক্রেতার আহ্বান।

টেনে নামানোটা আমাদের দিনগত পাপক্ষয়ের অনুষঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। সন্দেহ হয় এমন একজন বাঙালিকে পাওয়া যাবে কি না যিনি বুক ঠুকে বলতে পারেন, জীবনে অন্তত একবার ক্ষণিকের জন্য হলেও কাউকে টেনে নামানোর কথা মনে হয়নি বা নিজে অন্যের দ্বারা পতিত হননি। এমন বিরল কাঁকড়ার সন্ধান পেলে তাকে ক্ষণজন্মা ধরে নিয়ে তৎক্ষণাৎ মমি করে রাখার ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

আর যিনি জীবনে কেবল একবারই এমন অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়েছেন সেই বং সন্তানকে আমরা ‘কাঁকড়াভূষণ’ খেতাব দিতে পারি। তেমনি যিনি এ ব্যাপারে সর্বোচ্চ পর্যায়ে সাফল্য পাবেন তাঁকে বছরের ‘কাঁকড়ারত্ন’ সম্মান প্রদান করা যেতে পারে। দেখা গেল, হুজুগে বাঙালির দৌলতে কাঁকড়াত্বকে স্বীকৃতি জানানোর জন্য প্রদত্ত পুরস্কারের সংখ্যা শারদ সম্মানকেও ওভারটেক করল অচিরেই। তখন দুর্গামণ্ডপে কাঁকড়াশ্রী, কাঁকড়া নং ১, মিনিস্টার কাঁকড়া, মিস্টার কাঁকড়া প্রভৃতি সম্মান প্রদানের ছড়াছড়ি। চ্যানেলে চ্যানেলে দেখা যাবে কাঁকড়া

বিষয়ক রিয়েলিটি শো। কোনওটা বাবা কাঁকড়া, কোনওটা মা কাঁকড়া কোনওটা আবার কেবল কাঁকড়া দম্পতিদের নিয়ে। জায়মান চ্যানেলে শুনবেন অনেক গবেষণার পর তারা ঠিক করেছে, নিষ্পাপ শিশুদের মধ্যেও নাকি কাঁকড়াত্বের সুপ্ত প্রতিভা রয়েছে। তাকে খুঁজে বার করতেই শুরু হল লি'ল চ্যাম্প কাঁকড়া রিয়েলিটি শো। বাবা-মায়েরা তাদের শিবরাত্রির সলতেটিকে নিয়ে ছুটছেন কাঁকড়া হওয়ার ক্লাসে, নাচ-গান-আবৃত্তি-সাঁতার এর মতো। এভাবে চললে এমন দিন আর বেশি দূরে নেই— যখন দেখা যাবে কোনও নিঃসন্তান দম্পতি এসেছেন স্পার্ম ব্যাঙ্কে : ২৪ ক্যারাট বং-কাঁকড়া স্পার্মের খোঁজে!

ট্রেনে-বাসে-ট্রামে পকেট হালকা হওয়ার আতঙ্কে অনুমিত পকেটমারকে লক্ষ করে সহযাত্রীদের উদ্দেশ্যে আর এক অসহায় সহযাত্রী যা বলেন, তার মধ্যেও অন্তঃসলিলা ফল্গুর মতো রয়েছে সেই টেনে নামানোর মৌলিক স্বর। সুকুমারী ভাষায় মোদ্দা কথা— গায়ে ঢিলেঢোলা জামা, ভিড়ের মাঝে দিচ্ছে হামা / ওরে, টেনে নামা— নইলে কিচ্ছু মিলছে না।

টেনে নামানোতে ওস্তাদ যারা তাদের মধ্যেও ভেদাভেদ কম নয়। অর্থাৎ, নেশায় এবং কাজে নামানেওয়ালা হলেও ঘরানা তাদের এক নাও হতে পারে। যেমন, যিনি বিষ্ণুপুরী ঘরানায় নামিয়ে থাকেন তার সঙ্গে আলিগরি ঘরানার তফাত আছে বই-কী! কেমন? প্রথমটা যদি ধীর লয়ের হয়, তো পরেরটা হল দ্রুত তালের।

আবার, আপনি পশ্চিমাঞ্চলে যে ভাবে নামিত হবেন উত্তর বা দক্ষিণাঞ্চলে নামিত হবার ধরন তার থেকে আলাদা হতেই পারে। তবে, নাও হতে পারে। কারণ, মাইগ্রেশনের দৌলতে নামানোর হকদার কোথায় কখন কী অবস্থায় আছেন তার ওপর এটা অনেকটা নির্ভর করে।

মহাপুরুষদের টেনে নামানোতে বাঙালির জুড়ি মেলা ভার। রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, ডিএল রায় থেকে শুরু করে তথাকথিত কমিউনিস্ট— কতজন কতভাবেই না চেষ্টা করেছে। তাও নোবেল পাওয়াটা ঠেকানো যায়নি। কিন্তু নোবেল পাওয়ার পরও চেষ্টা থামেনি। কোনও কোনও রাজনীতিক তাঁকে বুর্জোয়া, সোনার চামচ মুখে জন্মানো জমিদার পুত্র, গজদন্ত মিনারবাসী বলে গাল পাড়লেও পরিণামে যা ঘটে, কবির ভাষায়— 'হাউই কহিল, মোর কী সাহস, ভাই,/ তারকার মুখে আমি দিয়ে আসি ছাই/ কবি কহে, তার গায়ে লাগে নাকো কিছু, / সে ছাই ফিরিয়া আসে তারি পিছু পিছু।'

সুইডেনের যুবরাজের ঠাকুরবাড়িতে আগমন এবং কিঞ্চিৎ খাতির-যত্ন প্রাপ্তিই নাকি রবীন্দ্রনাথের নোবেল প্রাপ্তির নোবেল কজ— এমন উচ্চমানের গবেষণা কিছুকাল আগেও দেখা যেত নামী পত্র-পত্রিকায়। আর 'জনগণমন' রাজা পঞ্চম জর্জের স্তুতি করে লেখা সেই বিশ্বাস সযত্নে লালন করতে ভালোবাসে অনেক বাঙালি, আজও।

বিদ্যাসাগরের বিরুদ্ধে ক্রমাগত বিষোদগার, গোষ্ঠীবদ্ধ অক্রমণ, জনমত গঠন কোন পর্যায়ে পৌঁছোয় সেটা মালুম হয় যখন তাঁকে শারীরিকভাবে নিগৃহীত হতে হয়। হায় বিদ্যাসাগর, মরেও রেহাই পাননি বেচারা। উগ্র বিপ্লবীরা তাঁকে জ্যান্ত অবস্থায় না পেয়ে শেষে তাঁর মূর্তি কালিমালিপ্ত করে এমন কী মুণ্ডচ্ছেদ পর্যন্ত

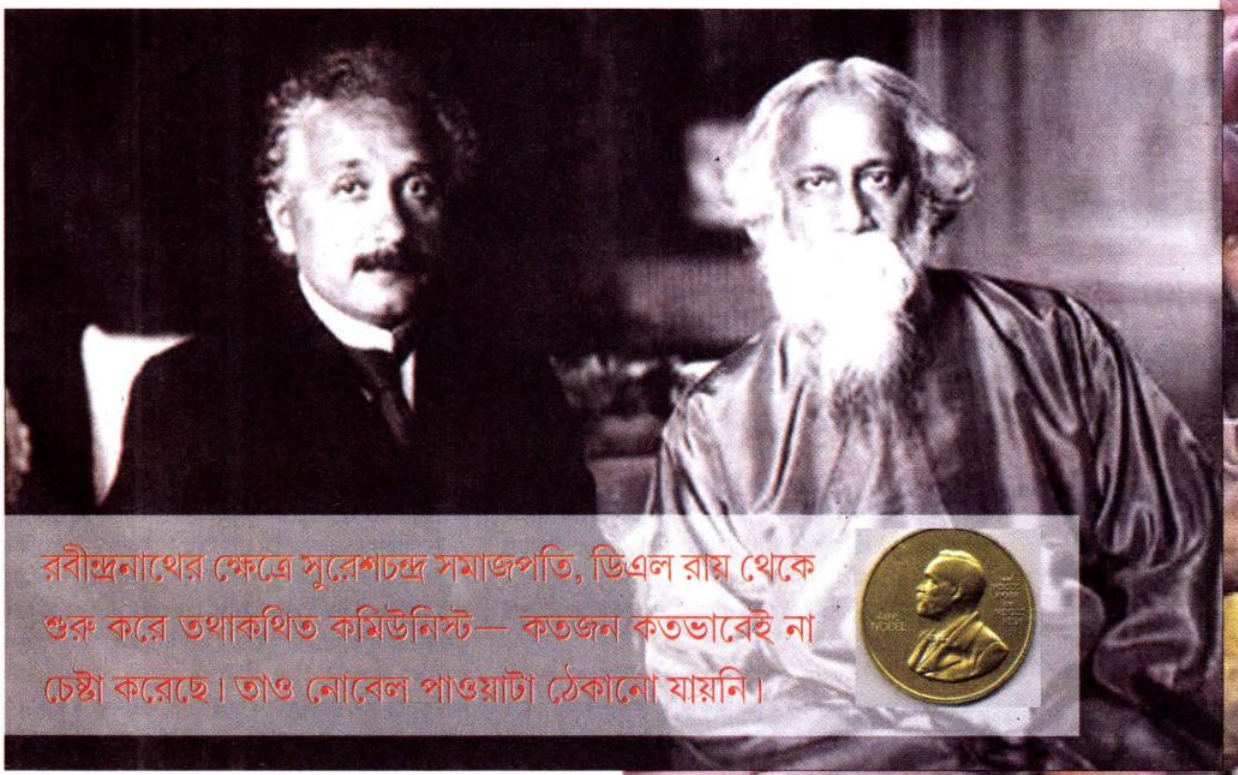

রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, ডিএল রায় থেকে শুরু করে তথাকথিত কমিউনিস্ট— কতজন কতভাবেই না চেষ্টা করেছে। তাও নোবেল পাওয়াটা ঠেকানো যায়নি।

উপমান ও উপমেয় হিসাবে বাঙালি ও কাঁকড়া শব্দের যুগলবন্দির নেপথ্যে আছে আংশিকভাবে হলেও কাঁকড়া হতে চাওয়া বিফল মনোরথ বাঙালিকুল।

করে।

ডাক্তার সুভাষ মুখার্জিকে মনে পড়ে। টেনে নামানোর বলি হন যিনি। দুনিয়ায় টেস্ট টিউব বেবির আবিষ্কর্তা হিসেবে প্রতিষ্ঠা তো পেলেনই না, সমপেশায় কতিপয় ঈর্ষাকাতর চিকিৎসক এবং নির্বোধ আমলাতান্ত্রিকতা তাঁর জীবন এতটাই দুর্বিষহ করে তোলে যে তিনি আত্মহত্যা করতে বাধ্য হন।

এই তো ক'বছর আগে দিস্তে দিস্তে লেখা এক বাঙালি কবি জ্ঞানপীঠস্থ হওয়ার বাসনায় লবি ম্যানেজ করছেন আর সে খবরটা কিনা প্রকাশ্যে বলে দিলে আরেক বাঙালি।

ঘরে-বাইরে সর্বত্র সক্রিয় বাঙালির এই টেনে নামানো। আপনি গদগদ ভঙ্গিতে স্ত্রী-কে বলতে গেলেন অফিসে আপনার প্রমোশন কিংবা বাড়ির বাইরে অর্জিত কোনও সাফল্যের কথা, দেখলেন আপনার ইস্ত্রি আপনাকে কনগ্রাচুলেট করা তো দূর অস্থ বরং যা বললেন তাতে আপনার অন্নপ্রাশনের ভাত বেরিয়ে আসতে পারে কি নিদেন পক্ষে আপনার কানপাটি তেতে যাবার পক্ষে যথেষ্ট। ফোর নাইনটি এইট-এর জাদুস্পর্শে নিরীহ গৃহস্বামীদের অনায়াসে কোথায় নামিয়ে থাকেন বং-কাঁকড়ার ফিমেল এডিশনরা তার নমুনা আকছাড় চোখে পড়ে। এ ব্যাপারে পীড়িত পুরুষ-পতি-পরিষদ-এর মতো সংস্থার অস্তিত্বই তার প্রমাণ।

উপমান ও উপমেয় হিসাবে বাঙালি ও কাঁকড়া শব্দের যুগলবন্দির নেপথ্যে আছে আংশিকভাবে হলেও কাঁকড়া হতে চাওয়া বিফল মনোরথ বাঙালিকুল। কাঁকড়া-দুর্নাম-এর মধ্য দিয়ে এই বিজাতীয়রা আসলে বোঝাতে চায়, বাঙালি স্বার্থপর, পরশ্রীকাতর, হিংসুটে, পরের সাফল্যের সম্ভাবনায় চোখ টাটায় যার ইত্যাদি, প্রভৃতি। বস্তুত বিষয়টিকে কে কী ভাবে কখন দেখছেন তার ওপর সিদ্ধান্ত ও মন্তব্য-প্রসব নির্ভর করে। যদি বিষয়টিকে সায়েন্টিফিক প্র্যাগম্যাটিজম বা বিজ্ঞানসম্মত প্রয়োগবাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখেন তবে বোঝা যায় আসলে বাঙালি সাম্যবাদী। অন্যের একক সাফল্যের বদলে সে সমবেত সাফল্যদর্শনে বিশ্বাসী, প্রয়োজনে অপেক্ষায় সদা আগ্রাসী। বোকা সাফল্যসন্ধানীরা বোঝে না, আগে গেলে বাঘে খায়, পরে গেলে 'সবাই' পায়। যত্তো সব, বোলবোলা সমালোচকরা জানে না, আমাদের গিলে করা ভাবনা ফিক্সচারের ভাঁজে নিপুণ পিকো করা আছে নামাবলি— হরি দিন তো গেল অনেক হল এগোতে গিয়ে হাঁকড়ে মলো (ব্যাক গ্রাউন্ডে দাঁড়া ব্যাণ্ডের সমবেত উদ্দাম চিয়ারলিডিং)।

নীহাররঞ্জন গুপ্তের গোয়েন্দা কাহিনিতে রেগুলার ইন্টারভ্যালে একটা বাক্যাংশের সম্মুখীন হতে হয় পাঠককে— 'ধূমায়িত চায়ের কাপ'। লাল কাঁকড়ার পাল্লায় পড়লে তেমনি আপনার হবে ধূমায়িত ভবিষ্যৎ দর্শন। আপনি দেখবেন বুঝবেন অনুভব করবেন এমন কী অন্যের দৃষ্টিতেও ধরা পড়বে আপনার পাতাল প্রবেশের অবস্থাটা, কিন্তু, কিছুতেই আপনি এর জন্য দায়ী পার্টিকুলার লাল কাঁকড়াটিকে আইডেনটিফাই করতে পারবেন

না। বিষয়টি পদার্থবিদ্যায় লীনতাপ latent heat-এর সঙ্গে তুলনীয়।

টেনে নামানোটা অনেকের কাছে জন্মগত অধিকার বলে বিবেচিত হয়ে থাকে। কোনও কোনও রাজনীতিক বিশেষত কামিয়েনিস্টদের মধ্যে এটা এক সহজাত প্রবৃত্তিস্বরূপ প্রকট হয়ে থাকে। শহর থেকে যত গ্রামের দিকে যাবেন ততই ব্যস্তানুপাতে কমতে থাকে এর দৃশ্যমানতা এবং বাড়তে থাকে তার পোস্ট এফেক্ট। শেষমেশ ম্যাজিক রিয়েলিজমের লোকাল এডিশন।

যারা বলেন টেনে নামানোর জন্যই টেনে নামানো (কতকটা আর্ট ফর আর্ট সেক-এর কেতায়) তারা হয়তো খেয়াল করেন না এর নেপথ্যে রয়েছে স্বতত সক্রিয় এক দার্শনিক ভাবনা, সেটা হল ঈষদপনিষদ-এর প্রথম শ্লোক: 'তেন তাপ্তেন ভুঞ্জিতা' অর্থাৎ ত্যাগের মধ্য দিয়ে ভোগ করো। টেনে নামানোটা আসলে বৃহত্তর জনস্বার্থে অধঃপতিত ব্যক্তিকে এই শিক্ষা দেওয়ার এক প্রচেষ্টা মাত্র।

সদ্য সমাপ্ত লন্ডন অলিম্পিকে গন্ডাকয়েকে ব্যাডমিন্টন প্লেয়ারকে ইভেন্টের মাঝপথে দেশে ফেরার ফ্লাইট নম্বর জানিয়ে দেওয়া হয়, একই দেশের একজন আরেকজনকে অন্যায়ভাবে কতকটা গটআপ ঢঙে সুবিধে পাইয়ে দিচ্ছেন— এই অভিযোগে। হায় প্যালা, একই সিচুয়েশনে দুই বা ততোধিক বাঙালি প্লেয়ার থাকলে এসব ল্যাটা ইভেন্ট শুরুর অনেক আগে চুলোচুলি রাউন্ডে চুকে যেত। থাকত কেবল বড়জোর এক কাঁকড়া।

সোজা কথা, টেনে নামানোর হেভিওয়েট না হোক নিদেন পক্ষে একটা লাইট ওয়েট ইভেন্ট থাকলে দেখা যেত, এই একটা ব্যাপারে গোল্ড-সিলভার-ব্রোঞ্জ সবক'টা মেডেল বাঙালির জিম্মায়। ভেবে দেখুন, সেক্ষেত্রে পদকজয়ীরা দেশে ফেরার পর এই বাংলায় এক সংবর্ধনা জানানো খাতে কত শত বাঙালির সাময়িক কর্মসংস্থান হতে পারত। কিংবা, যদি থাকত টেনে নামানো, টেনে বসানো ও টেনে শোয়ানো (এটা আবার ঈষৎ অন্ধকারে হলে রগড় জমে ভালো)— এই ত্রয়ীর সমন্বয়ে ট্রায়াথলন ইভেন্টটি।

একবার কল্পনা করুন, টেনে নামানোয় ডু অ্যাজ ইউ লাইক ইভেন্ট চলছে। হয়তো দেখা যাবে, খেলাটির ইন্টারন্যাশনাল পেরেন্ট বডি থেকে যে কোনও চ্যাম্পিয়নশিপ-এ থিকথিক করছে বাঙালি। কোয়ালিফাইং রাউন্ড পেরোনোরই লোক পাওয়া যাচ্ছে না। এমন কী ওয়াইল্ড কার্ড এন্ট্রি নিলে আকর্ষণীয় পুরস্কার সহ মিস ইউনিভার্স মার্কা বউ ফ্রি বিজ্ঞাপনেও অন্য জাতের প্রতিযোগী পাওয়া যাচ্ছে না।

এই এক ধাক্কায় বং স্পোর্টস কালচার কাম টেনে নামানো কোন্ হাইটে যেত ভাবতে পারেন! যে শালারা ফ্লাডফ্লাডানি আলোয় স্টেডিয়াম-বার থেকে চেঁচিয়ে এতদিন আমোদগেঁড়ে 'বিষ-বিশ'-এর রকমারি খেলায় বাহবা দিচ্ছিল, সেই চিল্লানোসেরাসদের সামলাতে তখন ইস্পেশাল বাহিনী বানাতে হত পুলিশকে। আমাগো এক সহজাত দক্ষতা স্রেফ উপযুক্ত মার্কেটিংয়ের অভাবে কত কিছু চেপে গেল চুপি চুপি একা একা। এখনও সময় আছে, কাঁকড়ার মতো টেনে নামানোর আনুষঙ্গিক বখেড়াবহুল বহুমাত্রিক নটঘটে খেলায় আমাদের সাবলীলতা মদীয় ভবনে গোপন গহনে মরচে পড়ে হারিয়ে যাবার আগে তাকে অফিসিয়ালি প্রোমোট করতে পাল্লে বাঙালির একটা হিল্লে হয়ে যেত। এমন কী আমজনতাকে এক পোস্ট মডার্ন মোচড় দেওয়া যেত।

চিরকালের বাঙালি বঞ্চনার ইতিহাসের মুখ্য ভূমিকায় থেকে নেতৃত্ব দেওয়ার তালিকায় এবার নতুন সংযোজন 'দ্য গ্রেটেস্ট ইন্ডিয়ান' শো। প্রসঙ্গত জানিয়ে রাখা ভাল উদ্যোক্তা রাজদীপ সরদেশাই-এর স্ত্রী এবং সিএনএন আইবিএন-এর ডেপুটি এডিটর সাগরিকা ঘোষ নিজেও একজন বাঙালি। তা সত্ত্বেও বাঙালিয়ানা ভুলে সাগরিকাও বেশ স্বচ্ছন্দেই 'দ্য গ্রেটেস্ট ইন্ডিয়ান' পোলে রবীন্দ্রনাথ, সুভাষচন্দ্র বসু, কাজী নজরুল ইসলাম সহ একাধিক বিশ্বখ্যাত বাঙালি ব্যক্তিত্বের অনুপস্থিতি মেনে নিয়েছেন। বাদ পড়েছেন চিত্রশিল্পী যামিনী রায়, নন্দলাল বসু, নৃত্যশিল্পী উদয় শঙ্কর, জনসেবক ডঃ বিধানচন্দ্র রায়, পন্ডিত আলাউদ্দিন খাঁ, বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসু, সত্যেন্দ্রনাথ বোস, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় সহ অনেকেই। প্রশ্ন উঠতে পারে কেনই বা এঁরা ব্রাত্য রয়ে গেলেন সিএনএন আইবিএনের 'দ্য গ্রেটেস্ট ইন্ডিয়ান' শোয়ের নমিনেশন থেকে? শুধুমাত্র বাঙালি বলেই কি? হয়ত সে কারণেই বঞ্চনার শিকার হতে হল তাঁদের।

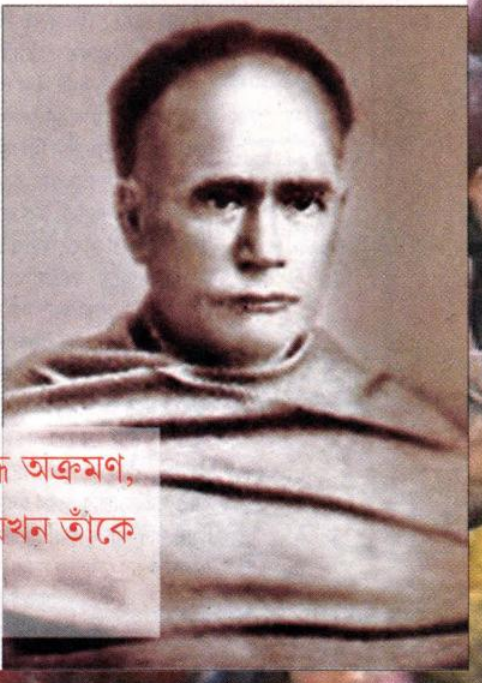

মজার ব্যাপার, লক্ষ করলে দেখবেন এক ঝুড়ি কাঁকড়ার মধ্যে প্রত্যেকেরই নজরটা উঁচুর দিকে। যে কেউ নিজের বন্দিদশা ঘোচাতে উদ্যত হওয়া মাত্র, কে বা আগে প্রাণ করিবেক দান-এর তৎপরতায় তাকে ঘরে ফিরিয়ে আনতে কাঁকড়ার অভাব হয় না। কাঁকড়াগত এই বৈশিষ্ট্যই প্রতিফলিত হয় বাঙালির আচার-আচরণে। যেমন

বিদ্যাসাগরের বিরুদ্ধে ক্রমাগত বিষোদগার, গোষ্ঠীবদ্ধ অক্রমণ, জনমত গঠন কোন পর্যায়ে পৌঁছোয় সেটা মালুম হয় যখন তাঁকে শারীরিকভাবে নিগৃহীত হতে হয়।

কাঁকড়ার সঙ্গে বাঙালির দূরসম্বন্ধীয় কোনও জেনেটিক রিলেশনশিপ আছে কি না— বিষয়টি নিয়ে যতটা গবেষণা হওয়া উচিত ছিল, সম্ভবত তা হয়নি।

ভ্রূণাবস্থায় একটা সময় পর্যন্ত স্তন্যপায়ী, জলচর (মাছ), উভচর (ব্যাং) এবং মানুষ—সকল ভ্রূণের মধ্যে পরিবর্তনগত সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। তবে, কাঁকড়ার সঙ্গে বাঙালির দূরসম্বন্ধীয় কোনও জেনেটিক রিলেশনশিপ আছে কি না— তা অবশ্য আমার জানা নেই। বস্তুত বিষয়টি নিয়ে যতটা গবেষণা হওয়া উচিত ছিল, সম্ভবত তা হয়নি। নাহলে, জাতিসত্তার এই অমোঘ বৈশিষ্ট্যের জন্য দায়ী জিন-এর অস্তিত্ব এতদিনে নিশ্চয়ই জানা যেত। সেক্ষেত্রে বাঙালি বংশানুক্রমে কাঁকড়া–এই বক্তব্যেরও একটা সুলভ সমাধান মিলত।

তবে, বর্তমান অবস্থায় একেবারে হতাশ হবেন না। কারণ, ভাবগত হাত ধরাধরিটুকুকে অস্বীকার করে এমন সাধ্যি কার? 'হিংসা কোরো না তোমারও হবে', 'হিংসা কোরোনা, চেষ্টা করো, তোমারও হবে' জাতীয় বাহনলিপি তো বাঙালি কাঁকড়াত্বকে লক্ষ করেই লেখা হয়। বড় কথা, রবীন্দ্রনাথ সেই কবেই বলে গেছেন: '...আমরা... তিল পরিমাণ বাক্য রচনা করিতে পারি, তিল পরিমাণ আত্মত্যাগ করিতে পারি না...'।

দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণ মাঝে মাঝেই বলতেন, 'মন-মুখ-এক করো। ভণ্ডামি কোরো না। বিশ্বাসযোগ্যতা হারিয়ো না।' বাঙালি আপনি, কাঁকড়া তুল্য হবেন কি হবেন না সেটা আপনার ব্যক্তিগত ব্যাপার, তবে হবার চেষ্টাটা ফ্রি। আর যিনি হতে চান তিনি যদি আগে বলা শ্রীরামকৃষ্ণের কথাকটি অক্ষরে অক্ষরে পালন করার চেষ্টাটুকু সর্বদা 'অন' রাখেন, তখন গেধো-মেধোরা আপনার কাঁকড়া-ক্যারেক্টর 'অফ' বলার সুযোগ পাবে না। এদিকে হাই-ফাই ইন্টেলেকচুয়ালরা সাম্যবাদের ফ্রয়েডীয় গঠন বা রোববারের পাঁঠার কত কিলো মটন ভুলে তুরীয়ানন্দে নামানোর ছন্দে মাতে টানাটানির খেলায়।

আলোচ্য প্রসঙ্গে কয়েকটি প্রশ্ন রাখতে চাই আপনাদের দরবারে। অনেক খুঁজেও যার উত্তর পাইনি, কোনও কেতাবে, কোন বাঙালি কাঁকড়া টেনে নামানোয় সাম্মানিক ডি লিট প্রথম পান? পরবর্তিকালে আর কে কে এই উপাধি পেয়েছেন। দ্বিতীয়ত বাংলার কোন কাঁকড়া প্রতিষ্ঠান এই ডিগ্রি প্রদান করে? এগুলোর উত্তর জানতে পারলে কাঁকড়ার্জুন, কাঁকড়া খেলরত্ন ও দ্রোণাচার্য ইন কাঁকড়াকুল সিলেকশনে সুবিধা হত।

আচ্ছা টেনে নামানো সত্ত্বেও কি কোনও কাঁকড়া শেষ অবধি ফিনিশিং লাইন ক্রস করে সমুদ্রে মুক্তি পায় না? অবশ্যই পায়। বাঙালি কখনও কখনও টেনে নামানোর বিরুদ্ধে লড়ে জিতেও গেছে।

মতি নন্দীর 'কোনি'-র কথাই ধরা যাক। দুঃস্থ কোনি এবং তাঁর সাধারণ মধ্যবিত্ত কোচ 'খিদ্দা' যাবতীয় টেনে নামানোর অপচেষ্টাকে নস্যাৎ করে সাফল্যের ধ্বজাকে তুলে ধরেন। টেনে নামানোকে হারাতে পেরেছিলেন বলেই না বাঙালি শেষ পর্যন্ত বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথ, সুভাষ বোসকে পেয়েছে।

ও হ্যাঁ, ভুলে গেছি সেই অসাধারণ বাহনচিত্রটির কথা বলতে, ছুটন্ত ম্যাটাডোরের পাশের ক্যানভাসে আঁকা মুখোমুখি দুই কাঁকড়া। নীচে লেখা সেই অমরকথা— 'আমরা বাঙালী'। আত্মপরিচয়ের এতবড় লৌকিক নমুনা দেবার পরেও বলে দিতে হবে বাঙালি কী? ❖

A unit of
Rose Valley™
Happiness Unlimited

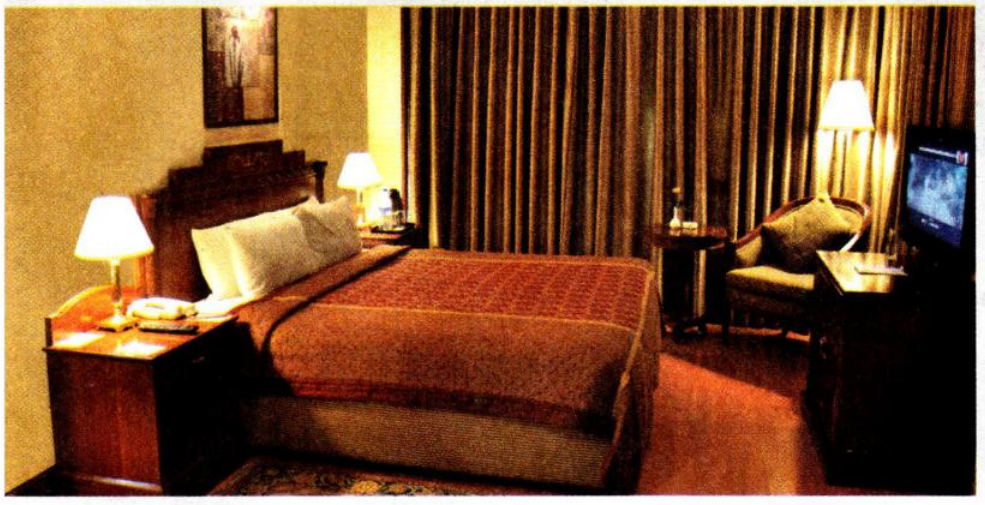

BE PROUD OF EVERY MOMENT YOU STAY!

Tripadvisor awards the Certificate of Excellence to Hotel Park Prime, Jaipur

Hotel Park Prime is the ultimate destination for your business or leisure travel in Jaipur. Located at the heart of the city, on Prithviraj Road, it delights you with world-class services and makes your stay one of the most memorable ones.

• High speed internet connectivity • Satellite television service • Mini bar in rooms • In-room electronic safe • Oasis, the multi-cuisine restaurant • The Terrace Grill, the rooftop barbeque • Henry's, the pub • 24-hour business services • Rooftop outdoor pool • Banquet hall • Boardroom • Health club

For Bookings, Call: +91 141 2360202/ 90070 22890/ 91633 99988/ 98316 99888

Hotel Park Prime, Jaipur is grateful to all its valued guests who've made it achieve this laurel.

Park Prime
JAIPUR

C-59, Prithviraj Road, C-Scheme, Jaipur-01
www.parkprime.net

গল্প

নারী সেবা রত্ন

দীপঙ্কর দাস

'আমি আমার বক্তব্য আর দীর্ঘ করব না। আপনারা সারা দিন ধরে বিভিন্ন বক্তার ভাষণগুলি ধৈর্য সহকারে শুনেছেন। মূল্যবান ভাষণগুলি শুনে মনের ভেতর সযত্নে সংগ্রহ করে রেখেছেন। এর জন্য আমাদের সংস্থার সম্পাদক হিসেবে আমি আপনাদের আন্তরিক ধন্যবাদ দিতে চাই। সেই সঙ্গে বিনয়ের সঙ্গে মনেও করিয়ে দিতে চাই যে বক্তাদের মূল্যবান ভাষণগুলিকে মনের ভেতর সযত্নে সংগ্রহ করে রাখলেই চলবে না।

প্রতিটি ভাষণের সারবস্তুগুলিকে সমাজ জীবনে প্রয়োগের জন্য আপনাদের আরও উদ্যোগী হতে হবে। কারণ আমরা সকলেই জানি যে বছরের একটি দিনকে 'নারী দিবস' রূপে পালন করে, সভা সমিতির এবং সেমিনারের আয়োজন করেই আমাদের দায়িত্ব ফুরিয়ে যায় না। নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য আমাদের আন্দোলন একটি নিরবচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া। বছরের কেবল একটি দিনেই এই আন্দোলন থেমে থাকার নয়।' এতদূর বসে বিজয়া জয়সওয়াল একটু থামলেন। সামনের টেবিলে রাখা ঠান্ডা মিনারেল ওয়াটারের বোতলের ছিপি খুলে বোতল থেকে সামান্য জল মুখে ঢেলে গলাটা ভিজিয়ে নিলেন। যদিও সেমিনার হলটি আদ্যন্ত শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত এবং হলের দুটো টায়ার মিলিয়ে আসন সংখ্যা পাঁচশোর কাছাকাছি, আর এটাও বাস্তব যে সেমিনার হল এখন আমন্ত্রিত শ্রোতাদের উপস্থিতিতে পরিপূর্ণ,—তবু শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত হল ঘরেও একসঙ্গে এত বিপুল সংখ্যক শ্রোতার উপস্থিতির কারণে বিশেষ করে উপস্থিত শ্রোতাদের সিংহ ভাগটাই মহিলা হওয়ার ফলে সেমিনার হলে কিছুটা গুমোট ভাব জেগে উঠেছে। গুমোট হওয়ারই কথা। উপস্থিত মহিলা শ্রোতারা প্রায় সকলেই সমাজের অভিজাত এবং যথেষ্ট আর্থিক সঙ্গতিপূর্ণ পরিবারের মহিলা। শারীরিক অপুষ্টিজনিত কারণে রক্তাল্পতায় ভোগার প্রশ্নই নেই। পরিবর্তে উচ্চ পুষ্টিগুণ সম্পন্ন খাদ্যের প্রাচুর্যে এবং ন্যূনতম শারীরিক শ্রমহীনতায় প্রায় সকলের শরীরে মেদের আধিক্যই বড় বেশি প্রকট। এই সব নারীদের শরীরের রক্তে এমনিতেই প্রয়োজনাতিরিক্ত ক্যালোরির নিরন্তর দহন প্রক্রিয়া চালু থাকার জন্য স্বাভাবিক অবস্থাতেই শরীর থেকে যথেষ্ট তাপ বিকিরিত হয়। তার ওপর বিশ্বনারী দিবস উপলক্ষে প্রায় সকলেই চড়া মেক আপের সাজে নতুন শাড়ি পরে উপস্থিত হয়েছেন। বলাবাহুল্য অধিকাংশের পরনের উচ্চমূলের শাড়িগুলি আজকের দিনে ব্যবহারের জন্য শহরের বিশেষ কয়েকটি শাড়ি হাউসগুলি থেকে সদ্য সদ্য কেনা। তার ওপর অধিকাংশ শাড়িও তাঁতের নয়। কৃত্রিম সুতোর সিনথেটিক শাড়ি। সঙ্গে সারা শাড়ি জুড়ে মরুভূমির মধ্য-দুপুরের রোদে চিকচিক করে জ্বলে ওঠা অসংখ্য অভ্র কুচির মতো জরির চুমকি ছড়ানো। নতুন শাড়ি এমনিতেই যথেষ্ট গরম ভাব ছড়ায়। তার ওপর জরি রাংতায় মোড়া সিনথেটিক শাড়ি হলে তো কথাই নেই। তাই সেমিনার হল ইতিমধ্যেই এতটাই উষ্ণ হয়ে উঠেছে যে শ্রোতারা প্রায় সকলেই হাতের ব্যাগ থেকে রুমাল বের করে ঘনঘন ঘাড়ে কপালে জমে ওঠা শ্বেত বিন্দুগুলি মুছে নিচ্ছে। অবশ্য রুমালকে ব্যবহার করতে হচ্ছে অত্যন্ত যত্ন সহকারে। গ্রাম্য মহিলাদের মতো গামছা সদৃশ দশহাতি শাড়ির আঁচল দিয়ে গোটা মুখটা মুছে ফেলার মতো বিলাসিতা দেখানোর উপায় নেই। তাহলে চড়া ফাউন্ডেশনের মেক আপ দেবড়ে গিয়ে মুখের যাবতীয় আকর্ষণও উধাও হয়ে যাবে, ভুরু আর আইলাইনারের কৃত্রিম কাজল, দুই চোখের পাতার ওপর রঙিন ব্রাশ এবং দুই ঠোঁটের পলাশ রঙা ওষ্ঠরঞ্জনী সব মিলে মিশে মুখের এমন কদাকার চেহারা করবে যে তখন মুখ লুকানোর রাস্তা থাকবে না।

'আমরা কিছু কিছু অধিকার অর্জন করেছি ঠিকই, তবে এখনও অনেক কিছু অর্জন করা বাকি আছে। আমাদের কেবল নগরকেন্দ্রিক আন্দোলনে নিজেদের সীমাবদ্ধ করে রাখলে চলবে না। আমাদের রুরাল ফিল্ডে গিয়েও নারী জাগরণ ঘটাতে হবে। এই কারণে আমরা একটি নতুন পরিকল্পনা রচনা করেছি। নাম দিয়েছি —'গ্রামীণ মহিলা জাগরন পরিকল্পনা।' সংক্ষেপে যাকে বলা হয়েছে 'রেপ।' এই প্রকল্পটি ইতিমধ্যে রাষ্ট্র সঙ্ঘের নারী কল্যাণ দপ্তরের অনুমোদন তো পেয়েছেই। সেই সঙ্গে...।' সেমিনার হলটি প্রথম ভাগের সূচনা থেকেই কখনও তেমন নিঃশব্দ ছিল না। আমন্ত্রিত শ্রোতৃমণ্ডলীর মধ্যে মৃদুস্বরে পরনের শাড়ি কিংবা ব্লাউজের অভিনব কাটিং থেকে শুরু করে বাড়ির কাজের মেয়েটির বেয়াড়াপনা, পোষা কুকুরটির পটির কাঠিন্য ইত্যাদি গুরুতর বিষয় নিয়ে পারস্পরিক মত বিনিময়ের পালা ঠিকই চলছিল। ফলস্বরূপ হালকা গুঞ্জন ধ্বনি খেলে যাচ্ছিল হলঘরে। কিন্তু বিজয়া জসওয়ালের মুখ থেকে নারী জাগরণ সমিতির ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাটির সংক্ষিপ্ত নামকরণটি শুনে সেই গুঞ্জন ধ্বনি একরকম কোলাহলে পরিণত হল। এমনকী কেউ কেউ আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে প্রতিবাদের নাড়াও লাগাতে শুরু করল। অবস্থা বেগতিক দেখে ভগবতী মালহোত্রা বিজয়ার কানে কানে বললেন—কি দরকার ছিল শর্ট কাট করা। ডাবলিউ আর এ পি-- মিলিয়ে রেপ উচ্চারণ হয় নাকি! বলুন র‍্যাপ র‍্যাপ। —বন্ধুগণ, আপনারা ধৈর্য ধরুন। শুনুন আমার কথা। ইট ইজ মিয়ার অ্যা মিস্টটেক অফ প্রোনানশিয়েশন। রেপ নয়। র‍্যাপ। 'রুরাল উইমেন অ্যাওয়েকেনিং প্রোগ্রাম।' আর, ডাবলিউ, এ, পি—র‍্যাপ্....। কিন্তু কে শোনে কার কথা। সেই সকাল দশটা থেকে চলছে ভাষণ। শ্রোতৃমণ্ডলীও এখন থেকেই পারিবারিক, ব্যক্তিগত, গৃহপালিত পেট সম্পর্কিত যা যা বিষয় নিয়ে পারস্পরিক ভাব বিনিময়ের কাজ ছিল, তাও শেষ করে ফেলেছে। যদিও সাড়ে এগারোটায় হাই টি উপলক্ষে হাফ অ্যান আওয়ার এবং দুপুর দেড়টা থেকে আড়াইটা লাঞ্চ ব্রেক দেওয়া হয়েছিল। লাঞ্চও যতই হেভি এবং টেস্টি প্যাকেজ হোক, হজম হয়ে গেছে বহুক্ষণ আগেই। এখন রাত আটটা প্রায় বাজো বাজো। আটটায় হাই ডিনার। তার আকর্ষণেই তো তারা এতক্ষণ সমিতির বিশিষ্ট অফিস বেয়ারারদের ভাষণ শুনছিল। এর পরেও যদি ভাষণ চলতে থাকে, তবে স্বাভাবিক কারণেই শ্রোতাদের ধৈর্যচ্যুতি ঘটার কথা। কিন্তু উপযুক্ত কারণ ছাড়া ধৈর্য হারিয়ে শোরগোল করে ভাষণ বন্ধ করিয়ে ডিনার অ্যাটেন করার জন্য সেমিনার হল ছেড়ে যাওয়াটা একটু দৃষ্টিকটু হয়ে যায় বলে শ্রোতারা কষ্ট করেই ধৈর্যকে চেপে রেখেছিল। কিন্তু স্বয়ং সমিতির সম্পাদকের মুখ থেকে 'রেপ' নামক আপত্তিকর শব্দটি উচ্চারিত হওয়ার মতো ইস্যুটাকে অবলম্বন করে শ্রোতারা প্রতিবাদে মুখর হয়ে সভায় ইতি টানার জন্য এতটাই ব্যগ্র হয়ে উঠল যে বিজয়া। জয়সোওয়ালের উচ্চারণের ভুল স্বীকারও তাদের শান্ত করতে পারল না। অবস্থা বেগতিক দেখে সভার সঞ্চালক শহরের বিশিষ্ট ধনকুবের রাজেশ বাটপাড়িয়া দ্রুত হাতে মাইক তুলে নিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করে দিলেন। সেই সঙ্গে পূর্ব নির্দিষ্ট প্রোগ্রাম অনুযায়ী শ্রোতাদের হাই ডিনার-এ উপস্থিত হওয়ার জন্য অনুরোধ করলেন। অনুরোধ সম্পূর্ণ হওয়ার আগেই অবশ্য শ্রোতারা সেমিনার হল খালি করে পাশের ডাইনিং হলে সাজানো এক একটি ডিনার টেবিল আলো করে বসে পড়লেন।

—এটা কেমন হল মিস্টার বাটপাড়িয়া! ডায়াসে উপবিষ্ট বিশিষ্ট বক্তাগণের মধ্যে নারী কল্যাণ সমিতির কার্যকরী সভাপতি সুশীলা ভরদ্বাজ বাটপাড়িয়ার পাশের চেয়ারে এসে বসে বললেন।-- লাস্ট স্পিচটা তো আমার দেওয়ার কথা ছিল। আমাকে স্পিচ দেওয়ার সুযোগ না দিয়েই আপনি মিটিং-এর সমাপ্তি ঘোষণা করে দিলেন যে!

সুশীলা ভরদ্বাজের অভিমান এবং কিঞ্চিৎ ক্ষোভ জাগার যথেষ্ট কারণ আছে। একে তিনি এই সমিতির কার্যকরী সভাপতি। তার ওপর তার হাজব্যান্ড এখন দিল্লির সাউথ ব্লকের ফরেন অ্যাফেয়ার্স মিনিস্টের জয়েন্ট সেক্রেটারির পদে কর্মরত। গৃহিণীর অনুরোধ বেচারা মিস্টার ভরদ্বাজ তার এক ছোকরা প্রাইভেট সেক্রেটারি অরবিন্দ ভাটিয়াকে দিয়ে সে নাকি বেশ কয়েকটি স্টোরি টোরি লিখে হিন্দি সাহিত্যে প্রতিশ্রুতিবান লেখকের সম্মান পেয়েছে, আজকের সেমিনারে পাঠ করার উদ্দেশে সুশীলার জন্য একটি জ্বালাময়ী ভাষণ লিখিয়ে তিনদিন আগেই ফ্যাক্স করে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন গিন্নির কাছে। আর সুশীলা জিও সেই ভাষণ গত তিনদিন ধরে ড্রেসিং টেবিলের আয়নার সামনে দিনে চারবার করে পড়ে পড়ে রিহার্স করে একেবারে কণ্ঠস্থ করে ফেলেছিলেন। এর পরেও যদি সমিতির সম্পাদক বিজয়ার একটি সহজ ইংরেজি শব্দের ত্রুটি পূর্ণ উচ্চারণের খেসারত

বাটপাড়িয়া দেখলেন বিজয়া জয়সওয়াল তার কানে কানে কথা বলার জন্য সেই যে শরীরটা ঝুঁকিয়ে দিয়েছিলেন, এখনও সোজা করেননি। আশ্চর্য দক্ষতার সঙ্গে কাঁধের ওপর থেকে জরি রাংতা খচিত সিফনের পিচ্ছিল শাড়ির আঁচলটাকে খসিয়ে এমনভাবে বসে আছেন যে ওপেন শোল্ডার জামার আড়াল থেকে সুডৌল স্তনদ্বয়ের বিভাজিকা বাটপাড়িয়ার চোখ দুটোকে টেনে এনেছে বুকের ওপর।

দিতে গিয়ে মূল্যবান স্পিচটি ডেলিভারি করা থেকে বঞ্চিত হন সুশীলা, তাহলে ক্রোধ, ক্ষোভ, অভিমান হওয়াটাই স্বাভাবিক।

মিস্টার বাটপাড়িয়াও কম চতুর নন। কারণ তিনি যে কেবল লোক চরিয়ে খান না, এমন নয়। নিজের এক্সপোর্ট-এর ব্যবসাকে সাগর পারেও ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য দিল্লির সাউথ ব্লকের ঘরে ঘরে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের বহু সচিব, যুগ্ম সচিব, উপ সচিবদের এক রকম পকেটে পুড়ে রেখেছেন। যদিও ঠিক এই মুহূর্তে মিস্টার বাটপাড়িয়ার মিনিস্ট্রি অফ ফরেন অ্যাফার্স-এর কাছ থেকে কোনওরকম ফেবার নেওয়ার প্রয়োজন নেই, তবুও সেন্ট্রালের এক গুরুত্বপূর্ণ যুগ্ম সচিবের সহধর্মিণীর বিরাগভাজন হওয়াটা যে মোটেই বিবেচকের কাজ হবে না, বুঝে পরিস্থিতি সামাল দেবার জন্য বললেন, সভা শেষ করে দেওয়া ছাড়া যে কোনও উপায় ছিল না ম্যাডাম। দেখলেন না অডিয়েন্স কেমন এজিটেড হয়ে উঠেছিল। তাই বলে দুখ্ রাখবেন না মনে। নেকস্ট সেমিনারে আপনি আজকের স্পিচটাকে একেবারে শুরুতেই ডেলিভার করে দেবেন। তখন অডিয়েন্স মেন্টালি অ্যান্ড ফিজিক্যাল অনেক ফ্রেশ থাকবে। আপনার স্পিচ ধ্যান দিয়ে ভি শুনবে।

—আরে, আজকের জন্য তো আমি সমাপ্তি ভাষণ মুখস্থ করে এসেছিলাম। নেকস্ট সেমিনারে সেই স্পিচটা ইনঅগুরাল স্পিচ হিসেবে ইউজ করব কেমন করে? মিসেস ভরদ্বাজের তখনও অভিমান যায়নি। গাল ফুলিয়ে বললেন।

—অল ইজ ওয়েল। বাটপাড়িয়া হাসতে গিয়ে স্ফীত মধ্যদেশের কম্পনে মুখটা এমনই বিকৃত করে ফেললেন যে 'অল ইজ সেম' কথাটা তার প্রিয় গানের কলি হয়ে মুখ ফস্কে বেরিয়ে গেল। কোনও রকমে সামাল দিয়ে বললেন বাটপাড়িয়া,—কেউ তো শুনবে না ম্যাডাম। কোনটা ইনঅগুরাল আর কোনটা কনক্লুডিং স্পিচ, —কী গেল এল বলুন।

অবশেষে মিসেস ভরদ্বাজ শান্ত হলেন। মঞ্চে উপবিষ্ট প্রায় সকলেই ডাইনিং হলে চলে গেছে দেখে তিনি আর সময় নষ্ট করলেন না। কী জানি কোনও টেবিলে এখনও কোনও সিট খালি আছে কি না।

দুই

—দেখেছেন মিস্টার বাটপাড়িয়া, এখনও আমরা কত কনজারভেটিভ হয়ে আছি!... ডিনার পরিবেশন করার আগে এখন টেবিলে টেবিলে উপবিষ্ট আমন্ত্রিত সদস্য এবং সদস্যারা ক্ষুধা বৃদ্ধির উদ্দেশে কিঞ্চিৎ ড্রিঙ্কস-এর গ্লাসে চুমুক দিচ্ছে। সেই সঙ্গে প্রতিটি টেবিল ঘিরে চলছে বাক্যালাপ। এই সব সদস্য এবং সদস্যারা প্রায় সকলেই নারী কল্যাণ সমিতির পূর্বাঞ্চল চ্যাপটারের প্রতিনিধি। তবে ভিন্ন অঞ্চলের এমন কী সাউথ ইস্ট এশিয়ার কয়েকটি দেশের সমমনস্ক সংগঠনের প্রতিনিধিরাও যে আমন্ত্রিত হয়ে আসেননি, এমন নয়। ফলে এত বড় ডিনার হল এখন গুঞ্জরিত হচ্ছে পারস্পরিক বাক্যালাপের ধ্বনিতে। তার মধ্যেই নিজের শরীরের ওপরের অংশটিকে যতদূর সম্ভব সামনের দিকে ঝুঁকিয়ে দিয়ে মিস্টার বাটপাড়িয়াকে বললেন, বিজয়া—সামান্য একটা ফল্টি প্রোনানসিয়েশন নিয়ে এমন কাণ্ড করে বসল সবাই, যেন আমি সত্যি সত্যি রেপিংকে সাপোর্ট করেছি।

সবে মাত্র প্রথম রাউন্ডের পানীয় শেষ হয়েছে। মাত্র এক রাউন্ডেই তৃষ্ণা মিটে ক্ষুধার উদ্রেক হবে, এমন অনভ্যস্ত স্টমাকের অধিকারী কেউ নয়। তা ছাড়া দুপুরের লাঞ্চ এবং রাতের এই ডিনারের ব্যয় ভার তো নারী কল্যাণ সমিতি বহন করছে না। দুপুরের লাঞ্চ স্পনসর করেছে একটি বহুজাতিক কনডোম প্রস্তুতকারী সংস্থা। আর রাতের ডিনার স্পনসর করছে একটি ইন্দো-ফরাসি যৌথ উদ্যোগে মেয়েদের বডি স্প্রে প্রস্তুতকারক সংস্থা। ভাগ্যিস ভারতীয় বাজার আজ কয়েক বছর ধরে ওপেন হয়ে গেছে। ফলে বিদেশি পুঁজির কাছে এই ভারতের বাজার এখন আক্ষরিক অর্থেই হ্যাপি রেপিং গ্রাউন্ড হয়ে উঠেছে। যে নারী কল্যাণ সমিতির বার্ষিক অধিবেশন উপলক্ষে সারাদিনব্যাপী সেমিনারে আনুমানিক পাঁচশো মহিলা এবং পুরুষ সমবেত হবে যারা সকলেই সমাজের রীতিমতো সচ্ছল এবং অভিজাত শ্রেণির প্রতিনিধি—অর্থাৎ বিদেশি পুঁজিপতিদের কাছে টার্গেট গ্রুপ। সেখানে লাঞ্চ ডিনার, হাই টি পরিবেশনের ব্যয়ভার বহন করতে উদগ্রীব হয়ে আছে এই সব সংস্থা। সুতরাং তারাও বা কেন সামান্য পানীয় নিয়ে কৃপণতা দেখাবে।

দ্বিতীয় রাউন্ডের পানীয় পরিবেশন করে গেল টেবিলে টেবিলে। বাটপাড়িয়া দেখলেন বিজয়া জয়সওয়াল তার কানে কানে কথা বলার জন্য সেই যে সামনের দিকে শরীরটা ঝুঁকিয়ে দিয়েছিলেন, এখনও সোজা করেননি। পরিবর্তে আশ্চর্য দক্ষতার সঙ্গে কাঁধের ওপর থেকে জরি রাংতা খচিত সিফনের পিচ্ছিল শাড়ির আঁচলটাকে খসিয়ে দিয়ে এমনভাবে বসে আছেন যে গায়ের ওপেন শোল্ডার গলার জামার আড়াল থেকে সুডৌল স্তনদ্বয়ের বিভাজিকা বাটপাড়িয়ার চোখ দুটোকে সম্মোহিত করে টেনে এনেছে বুকের ওপর। বাটপাড়িয়া দ্বিতীয় রাউন্ডের পানীয়র গ্লাসটা এক চুমুকেই শেষ করে বিশ্রি গলায় হাঁক দিয়ে উঠলেন, ওয়েটার, নেক্সট ওয়ান।

আপনার জবানে রেপ উচ্চারণটা ভারি মিঠা শুনিয়েছিল। বাটপাড়িয়া আবার হাসতে গিয়ে আর এক বিপত্তি ঘটিয়ে ফেললেন। মধ্যদেশের মাত্রাতিরিক্ত চর্বির নাড়াচাড়ায় মুখ দিয়ে কুঁক কুঁক শব্দ বেরিয়ে এল। ভাবটা এমন যেন সে সত্যি সত্যি রেপিং-এর মজা নিচ্ছেন।

— থাক, আর মিঠার মজা নিতে হবে না আপনাকে। বিজয়া জয়সওয়াল দ্বিতীয় রাউন্ডের পানীয় শেষ করে মূল প্রসঙ্গে ফিরে গেলেন—আপনার দৌড় কতটা আমার ভালো করেই জানা আছে। এবারও যদি অ্যাওয়ার্ডটা ফস্কে যায়, তবে জানব আমার প্রতি আপনার কোন হামদরদি নেই।

বিজয়ার অভিমান ভরা মন্তব্য শুনে বাটপাড়িয়া মহাশয়ের নেশা কেটে যাওয়ার উপক্রম হল। সারা দেশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা যেসব সংস্থা দেশের নারী সমাজের কল্যাণের জন্য কাজ করে আসছে, সেই সব সংগঠনগুলির মধ্যে থেকে কেন্দ্রীয় সরকারের 'হিউম্যান রিসোর্স অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট' মন্ত্রণালয় প্রতি বছর নারী সমাজের কল্যাণে উৎসর্গীকৃত প্রাণ-- এমন একজন মহিলা প্রতিনিধিকে নির্বাচন করে 'নারী সেবা রত্ন'-এ ভূষিত করে থাকে। বলাবাহুল্য দেশের দারিদ্র্য পীড়িত এবং অন্ধকারাচ্ছন্ন নারী সমাজের উন্নতির কাজে নিবেদিত প্রাণ মহিলাদের চোখে 'নারী সেবা রত্ন' পুরস্কারটি রীতিমতো সর্বোচ্চ মর্যাদাপূর্ণ পুরস্কার হিসেবেই গণ্য হয়ে থাকে। আর রাষ্ট্রীয় পুরস্কার যখন, এখন এ দেশের আর যে কোনও ক্ষেত্রের পুরস্কারের মতোই এই পুরস্কারটি কখনও নিঃশব্দে নারী কল্যাণের কাজ করে যাওয়া কোনও নারীর ভাগ্যে জোটার কথা নয়। পুরস্কারটি জোটে তাদেরই—যারা নিজেদের মুখের ওপর মিডিয়ার যাবতীয় ফোকাস আকর্ষণ করে নিতে

জানে। আর সেই সঙ্গে হিউম্যান রিসোর্স মন্ত্রণালয়ের অধীনে নিযুক্ত নির্বাচকমণ্ডলীকে পর্যাপ্ত তোষামোদি এবং উপঢৌকন পৌঁছিয়ে দিতে পারে। আজ তিন বছর ধরে 'নারী কল্যাণ সমিতি'র সম্পাদিকা হিসেবে বিজয়া 'নারী সেবা রত্ন' পুরস্কারটিকে হাতানোর জন্য আদাজল খেয়ে লেগে আছেন। বিশেষ করে মিস্টার পাটপাড়িয়াকে সর্বস্ব দিয়ে বসে আছেন। কারণ মিস্টার বাটপাড়িয়া যে কেবল মস্ত বিজনেস টাইকুন, এমন নয়। বাটপাড়িয়ার মেজো শ্যালক আবার খোদ কেন্দ্রের এইচ আর ডি মন্ত্রণালয়ের রাষ্ট্রমন্ত্রী। সুতরাং বাটপাড়িয়া চাইলে সে পুরস্কারটি নাচতে নাচতে বিজয়ার হাতে চলে আসবে—এটাই স্বাভাবিক। এই কারণে বিজয়া জওসওয়াল তাঁর সমিতির বাকি সদস্যদের সঙ্গে রীতিমতো লড়াই করে সমিতির কেবল একজন সদস্য করিয়ে নিয়েছেন এমন নয়, সেই সঙ্গে বাটপাড়িয়াকে সমিতির যুগ্ম সম্পাদকের পদেও বসিয়ে দিয়েছেন। এর জন্য অবশ্য বাটপাড়িয়াকে সমিতির ফান্ডে প্রতি বছর লোভনীয় অঙ্কের ডোনেশন দিতে হয়। এতগুলি সম্ভ্রান্ত এবং ধনী পরিবারের অপ্সরাতুল্য রমণীর সঙ্গ লাভের যে বিরল ভাগ্য জুটেছে বাটপাড়িয়ার, তার তুলনায় ওই ডোনেশন তো বাটপাড়িয়ার কাছে হাতের ময়লা মাত্র। বিশেষ করে বিজয়া জয়সওয়ালের মতো এমন এক চার্মিং এবং সুইট মহিলার — চল্লিশ পার করেও যে মহিলা নিয়মিত জিম, বিউটি পার্লার, যোগা এবং মেডিটেশন-এর ক্লাস অ্যাটেন্ড করে শরীরের যৌবনকে আঠাশের ঘরে ধরে রেখেছেন সযত্নে—সঙ্গ লাভ তো মুখের কথা নয়। প্রয়োজন বোধ করলে বাটপাড়িয়ার সঙ্গে উইকএন্ড কাটানোর জন্য মন্দারমণি থেকে জলদাপাড়া—রিসর্টে রাত কাটানোর জন্য এক পায়ে প্রস্তুত হয়ে আছেন বিজয়া জয়সওয়াল। এত বড় প্রাপ্তির বিনিময়ে বিজয়াদের নারী কল্যাণ সমিতির ফান্ডে বৎসরান্তে কয়েক লক্ষ কেন, কয়েক কোটি টাকার চাঁদা দিতেও প্রস্তুত বাটপাড়িয়া। বিনিময়ে বিজয়াকে কেবল কেন্দ্র সরকারের নারী সেবা রত্ন নামক পুরস্কারটি পাইয়ে দিতে হবে।

ইচ্ছে করলে গত তিন বছরে কেন, প্রথম বছরেই বাটপাড়িয়া বিজয়াকে পুরস্কারটি পাওয়ার ব্যবস্থা করে দিতে পারতেন, কিন্তু পাইয়ে দেননি। কারণ প্রথম বছরে পুরস্কারের প্রধান দাবিদার ছিল মহারাষ্ট্রের একটি সংস্থার সভানেত্রী উর্মিলা যোশি। উর্মিলার হাজব্যান্ড মিস্টার যোশি আবার ট্রেড অ্যান্ড কমার্স মন্ত্রণালয়ের ডাইরেক্টার। তার কাছেই বাটপাড়িয়ার ইমপোর্ট কারবারে শুল্ক ফাঁকি দেওয়ার তদন্ত রিপোর্টটি জমা পড়েছিল। উর্মিলা যোশি হাজব্যান্ডকে ধরে কয়ে সেই রিপোর্টকে ঠান্ডা ঘরে পাঠানোর ব্যবস্থা করে দিয়েছিল। তাই শ্যামলকে দিয়ে উর্মিলাকেই নারী সেবা রত্নটি পাইয়ে দিয়েছিল। দ্বিতীয় বছর পুরস্কারটি পাইয়ে দিয়েছিল তামিলনাড়ুর উষা আয়েঙ্গারকে। কারণ সেবার মিস্টার বাটপাড়িয়ার এক লওতা বেটা রাজেন বাটপাড়িয়া-- যে এখন দীর্ঘদিন ধরে আমেরিকার এক শহরে লিখাই-পড়াই করার জন্য প্রবাস জীবন কাটাচ্ছে, সেখানে গোটা কয়েক নাদান ইয়ারদোস্তের সঙ্গে একটি নাইট ক্লাবে থোরা বহুত মস্তি করতে

লক্ষ্মীর খুব ইচ্ছে ছিল বিয়ের পরেও লেখাপড়াটা চালিয়ে যাবে। অন্তত গ্র্যাজুয়েশনটা শেষ করবে। কিন্তু বিজয়া বাধ সাধলেন। পুত্রবধূকে রীতিমতো শাশুড়িসুলভ গাম্ভীর্য নিয়ে বলেছিলেন—লিখাই পড়াই করে করবেটা কী শুনি? ওই নাচনিওয়ালি মেয়েদের মতো অফিস কাছাড়িতে নোকরি করবে নাকি? সাদির আগে যা করেছ, করেছ। তুমি ভুলে যেও না যে তুমি এখন জয়সওয়াল খানদানের বহু।

গিয়ে তোড়ফোড় করে পুলিশের হাতে পড়েছিল। সেই নাদান ছেলেকে দেশে ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থাটা উষা আয়েঙ্গারের হাজব্যান্ড-- যিনি আবার দিল্লির হোম মিনিস্ট্রির জয়েন্ট সেক্রেটারি— প্রভাব খাটিয়ে করে দিয়েছিলেন। বাটপাড়িয়া ভেবেছিলেন গত বছর বিজয়াকেই পাইয়ে দেবেন সেবা রত্ন পুরস্কারটি। কারণ সেবার গোটা খ্রিস্টমাসটাই সিঙ্গাপুর কাটানোর সময় বিজয়া বাটপাড়িয়াকে সঙ্গ দিয়েছিল। কিন্তু নসিব আর কাকে বলে! গত বছর নিউ ইয়ার্স ইভ-এর নাইটে বাটপাড়িয়ার স্ত্রীর ভগিনী পুত্র এক বার ড্যান্সারের রেপ কেসে জড়িয়ে পড়ে দিল্লির পুলিশের খপ্পরে পড়ে গেছিল। দিল্লির পুলিশ কমিশনারের মিসেস যিনি আবার নারী কল্যাণের কাজে নিযুক্ত একটি এন জি ও পরিচালনা করেন, সেই শরণজিৎ কাউরকে ধরে শ্যালিকার সুপুত্রকে জামিনযোগ্য ধারা প্রয়োগ করিয়ে তিসহাজারি কোর্ট থেকে বেল-এর ব্যবস্থা করিয়েছিলেন বাটপাড়িয়া। বিনিময়ে শরণজিৎ দেবীকে পাইয়ে দিতে হয়েছিল 'নারী সেবা রত্ন' পুরস্কারটি। এত কিছুর পরেও—অর্থাৎ তিন তিন বার নাকের পাশ ঘেঁষে পুরস্কারটি ফস্কে গেলে বিজয়া যদি অভিমান করে বাটপাড়িয়ার সঙ্গ ছেড়ে দেয়, তাহলে বাটপাড়িয়া কখনওই বলতে পারবে না যে বিজয়া জয়সওয়াল অন্যায় করেছে।

— মাই সুইট বিজয়া, ইস বরষ তুমি যদি পুরস্কারটি না পাও, তবে আমাকে লাথ মেরো। নেশার ঘোরে আবেগ সাধারণত একটু মাত্রা ছাড়া হয়ে যায়। মুখের কথারও বাঁধন আলগা হয়ে যায়। বিজয়া যত খারাপই হোক, বাটপাড়িয়ার মতো একজন পুরুষকে কোনও অবস্থাতেই যে লাথি মারতে পারবে না, এটাই প্রত্যাশিত। তাই বিজয়া আর কথা বাড়াল না। ডিনার শেষ করার জন্য মনোনিবেশ করল।

তিন

বারো বছর — অর্থাৎ এক যুগ কেটে গেছে। বিজয়া জয়সওয়াল ষাট ছুঁই ছুঁই। স্বামী গোবিন্দ জয়সওয়ালও এখন বার্ধ্যকে পৌঁছিয়ে গেছেন। ছেলে অরবিন্দ জয়সওয়ালই বাবার ব্যবসা দেখশোনা করে। দেখতে দেখতে অরবিন্দ-ও তিরিশ ছুঁতে চলেছে। বিজয়ার শরীর এখন অনেক স্ফীত হয়ে গেছে। হাঁটু আর কোমরে বাতের ব্যথার তীব্রতার জন্য স্বচ্ছন্দে চলাফেরা করতে পারেন না। ফলে বাড়ি থেকে খুব একটা বের হয় না বিজয়া। নারী কল্যাণ সমিতির সঙ্গে এখন আর কোনও যোগাযোগ নেই তার। বছর পাঁচ হল এক হনুমান সাধকের কাছে স্বামী-স্ত্রী দু'জনেই দীক্ষা নিয়েছে। গুরুজির আশ্রম আছে উত্তর কাশীতে। দীক্ষা গ্রহণের সময় সেই যে একবার গুরুজির আশ্রমে গিয়ে গুরুজির পবিত্র পাদপদ্ম স্বহস্তে স্পর্শ করার ভাগ্য হয়েছিল, তারপর চরণস্পর্শ করা তো দূরের কথা সাক্ষাৎটুকুও পাননি বিজয়া। কারণ এখন শরীরের যা হাল, তাতে উত্তরকাশী যাওয়া সম্ভব নয়। তাই গুরুজির ফোটো দেখেই দিন কাটে বিজয়ার। গুরুজির জন্ম তিথি উৎসবও বেশ ধুমধাম সহকারে বাড়িতে পালন করা হয়।

স্বামী স্ত্রী উভয়েই এতদিন ব্যবসা এবং নারী জাতির জাগরণের কাজে এতটাই ব্যস্ত ছিলেন যে গুছিয়ে ঘর সংসারটা করা হয়নি। এমনকী একমাত্র সন্তান পুত্র অরবিন্দও যে রীতিমতো বড় হয়ে বিবাহযোগ্য হয়ে উঠেছে, সেদিকেও তেমন নজর দিতে পারেনি। এখন অবসর পেয়ে ছেলের জন্য পাত্রী খোঁজায় মন দিলেন বিজয়া।

বিজয়ার মেজো দাদা ভাগ্নের জন্য একটি পাত্রীর খোঁজ নিয়ে এল। 'পাত্রী যথেষ্ট লেখাপড়া জানা এম এ পাশ। নিজেই একটা এন জি ও গঠন করে দেশের বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলের মেয়েদের মধ্যে সাক্ষরতা বৃদ্ধির জন্য নিজেকে উৎসর্গ করেছে। পাত্রী ঠিক করেছিল যে সারা জীবন অবিবাহিতই থাকবে। কিন্তু বিজয়া জয়সওয়ালের মতো নারী প্রগতিবাদী মহিলাকে শাশুড়ি হিসেবে পাবে বলে বিয়েতে রাজি হয়েছে। মেজো দাদা আরও বলল, —'নারী সেবা রত্ন' পুরস্কার পাওয়া শাশুড়ির গাইডেন্স পাবে বলে পাত্রী তোমার ঘরের বউ হতে এতটাই উৎসাহী হয়ে উঠেছে যে অরবিন্দ সম্পর্কে একটা কথাও জানতে চায়নি। বল তো রিস্তা পাকা করে ফেলি।

—আমি ঘরে বউ আনতে চাইছি ভাইয়া। বিজয়া ক্রুদ্ধ গলায় বলেছিল—বউ এসে শ্বশুর শাশুড়ির সেবা করবে। পুজো করবে। আর রসুই ঘর সামলাবে। এটাই ভারতীয় হিন্দু নারীর ধর্ম। গুরুজিও এটাই চান। ঘরের বউ ঘর থেকে বেরিয়ে নৌটঙ্কি করে বেড়াবে, সেটা আমি চাই না। তুমি অন্য কোথাও পাত্রী খোঁজো। শেষ পর্যন্ত নিজের গুরু ভগিনীদের চেষ্টায় বিজয়া সুদর্শন কুড়ি বছরের কন্যার সন্ধান পেয়ে পুত্রের বিয়ে দিলেন। পুত্রবধূ লক্ষ্মীর কলেজের পড়া শেষ হয়নি। সবে পার্ট ওয়ান পাস করে পার্ট টু প্রস্তুতি নিচ্ছিল। লক্ষ্মীর খুব ইচ্ছে ছিল বিয়ের পরেও লেখাপড়াটা চালিয়ে যাবে। অন্তত গ্র্যাজুয়েশনটা শেষ করবে। কিন্তু বিজয়া বাধ সাধলেন। পুত্রবধূকে রীতিমতো শাশুড়িসুলভ গাম্ভীর্য নিয়ে বলেছিলেন—লিখাই পড়াই করে করবেটা কী শুনি? ওই নাচনিওয়ালি মেয়েদের মতো অফিস কাছাড়িতে নোকরি করবে নাকি? সাদির আগে যা করেছ, করেছ। তুমি ভুলে যেও না যে তুমি এখন জয়সওয়াল খানদানের বহু। কথায় কথায় বাইরের পুরুষদের সামনে বেরোনো তোমাকে মানায় না।

অরবিন্দ চিরকালই বাধ্য ছেলে। তারপর ব্যবসার কাজে উদয়অস্ত এতটাই ব্যস্ত থাকে যে সারাদিনের মধ্যে স্ত্রীকে সঙ্গ দিতে পারে না। লক্ষ্মীর এখন দিন কাটে সকাল সন্ধ্যায় শ্বশুর শাশুড়ির গুরুজির আরাধনা করে, শ্বশুর শাশুড়ির সেবা যত্ন করে, আর সন্ধ্যার পর শাশুড়ির হাঁটুর ব্যথার উপশম ঘটানোর জন্য উত্তরকাশীর আশ্রম থেকে লোক পাঠিয়ে নিয়ে আসা গুরুজির মন্ত্রপূত তেল হাঁটুদ্বয়ে দীর্ঘ সময় ধরে মালিশ করে।

এ ছাড়াও লক্ষ্মীর আর একটি কাজ আছে। সকালের প্রথম রোদের কয়েকটা রশ্মি বাড়ির বৈঠকখানা ঘরের পুবের জানলা গলে বিপরীত দিকের দেয়ালে ঝোলানো সোনার বাঁধানো একটি ছবির ওপর যখন এসে পড়ে, তখন বাঁধানো তসবিরটাকে নামিয়ে ভালো করে মুছে আবার যথাস্থানে ঝুলিয়ে দিতে হয় লক্ষ্মীকে। প্রায় এক যুগ আগে দেশের রাষ্ট্রপতির হাত থেকে সাসজি কর্তৃক 'নারী সেবা রত্ন' গ্রহণ করার মুহূর্তের একটি এনলার্জডছবি সোনার ফ্রেমে বাঁধানো তসবিরের ওপর সকালের রোদ এসে পড়ার পর যখন তসবিরটা জ্বল জ্বল করে ওঠে, তখন কেন জানি রোজ সকালে লক্ষ্মীর দু'চোখের কোল ভিজে ওঠে। ❖

অলঙ্করণ: দেবযানী রায় ঘোষাল

বিশ্বের এক নম্বর

লিঙ্গবর্দ্ধক বিনামূল্যে

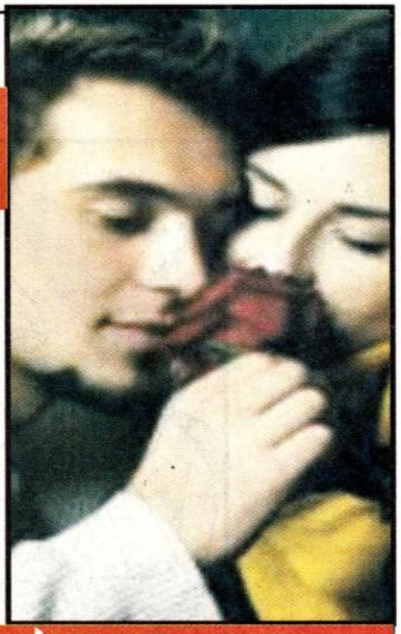

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়াহীন

১০০% ভেষজ

লিঙ্গকে ৩-৪ ইঞ্চি লম্বা, স্থুল, সোজা কারর জন্য আমাদের চিকিৎসার সুযোগ নিন। ২৫-৩০ মিনিট যৌনক্ষমতা বাড়াতে আমাদের চিকিৎসা অদ্বিতীয়

সাদা দাগ নিরাময় সম্ভব

আমাদের নতুন আবিস্কৃত এই ঔষধে ৬ থেকে ৮ ঘন্টার মধ্যে দাগের রং বদলাতে শুরু করে এবং চিরকালের জন্য ত্বকের স্বাভাবিক রং সুনিশ্চিত করে। পূর্ণ নিরাময়ের গ্যারান্টী। সম্পূর্ণ মেয়াদের চিকিৎসার জন্য সত্বর যোগাযোগ করুন। চিকিৎসার খরচ ৬৩০ টাকা, এবং ১২৬০ টাকা। চিকিৎসায় ফল না পেলে চিকিৎসাখরচ ফেরৎ দেওয়া হবে।

সফল আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা

আমাদের চিকিৎসায় আপনার স্তন সুন্দর, আকর্ষণীয় এবং মোহময় হয়ে উঠবে।

Money refund if no Benefit

মাত্র ২৮ দিনের মধ্যে ফল দেখুন

এক্ষুনি একটা ফোন করুন

✆ 09661833217 / 09905429328

আগে যা হয়েছে:

মাধবীলতা-অনিমেষ জলপাইগুড়ি যায়। ছোট মা বাড়িটা বেচে দিতে বলেন। অনিমেষ বুঝতে পারে চারপাশটা অনেক বদলে গেছে। উইল-মোতাবেক অনিমেষ সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত। সিপিএম জেলা সম্পাদক নৃপেনবাবু অনিমেষকে বাড়ি বিক্রির অনুমতি দেন। যদিও বাড়ির বৃদ্ধ ভাড়াটে বেঁকে বসে। খদ্দের দেখতে এসে কোর্টের কাগজপত্র তৈরি করতে বলে যায়। অনিমেষ সম্পত্তি নিতে অস্বীকার করলে মাধবীলতা অর্ককে ডেকে পাঠায়। উকিল জানায়, উইলের আসল কপি তাঁর কাছেই রয়েছে। চাইলেও কেউ বদমায়েশি করতে পারবে না। অনিমেষকে স্বপ্নেন্দু দত্ত ২৫ হাজার টাকা অগ্রিম ধরিয়ে দেয়। নিবারণবাবুকে লোকাল ক্লাবের ছেলেরা ভয় দেখায়। ব্যাপারটা অনিমেষ সৌমেনবাবুকে জানায়। জলপাইগুড়ি পৌঁছে অর্ক বাড়ি বিক্রি না করে মা-বাবাকে থেকে যেতে বলে। এদিকে, লোকাল ক্লাব আবার ঝামেলা শুরু করে। এস পি পঙ্কজ দত্ত অনিমেষকে ডেকে সাহায্যের আশ্বাস দেন। অর্ক কলকাতায় ফিরে আসে। শ্রীরামকে নিয়ে বস্তিতে কৌতূহল বাড়ে। ভোরবেলায় রামজিকে দিঘার বাসে তুলতে গেলে বুড়ির চিৎকারে গোটা বস্তি জেগে ওঠে। অলকা এই কথা জানায়। বাল্যবন্ধু দেবেশের বৃদ্ধাশ্রমে ছোট মাকে নিয়ে ঘুরতে আসে অনিমেষ-মাধবীলতা। অর্কর ফোন আসে। স্কুলে অলকার মেয়ের সুপারিশে নারাজ মাধবীলতা। অর্ক হেডমিস্ট্রেসের সঙ্গে কথা বলে ব্যবস্থা করে। শ্রীনিবাসকে না পেয়ে রামজি কলকাতায় ফিরে আসে। রামপ্রকাশকে ফোনে পাওয়া যায় না। ওদিকে, পাড়ার ক্লাবের ছেলেদের পুলিশ তুলে নিয়ে গেছে। অর্ক রামজিকে আত্মগোপনের জন্য গুরুমার আশ্রমে নিয়ে যায়। ছোট মাকে নিয়ে কোর্টে হাজিরা দেয় অনিমেষ-মাধবীলতা।

মৌষলকাল

স ম রে শ ম জু ম দা র

এখনও বাইরে কড়া রোদ, অর্ক রামজির দিকে তাকাল। রামজি তার তক্তপোশে বসে আছে অন্যমনস্ক হয়ে। কী ভাবছে তা জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছে হল না। ছেলেটাকে তার ভালো লেগেছে। আশ্চর্য ব্যাপার, এতদিন একসঙ্গে থেকেও রামজি তার অনেক কথাই বলতে চায়নি, অর্কও যেচে জিজ্ঞাসা করেনি।

।। পয়ত্রিশ ।।

অর্ক এখন বলল, 'নাঃ, রোদ কমলে অজয়ের ধারে যাব, এখন থাক।'

ঠিক তখনই সেই তরুণ শিষ্য দরজায় এসে দাঁড়াল, 'আপনি কী বিশ্রামে আছেন?'

'এখানে তো আর কিছু করার নেই। কী ব্যাপার ভাই?' অর্ক জিজ্ঞাসা করল।

'যদি বিশ্রামে না থাকেন তাহলে গুরুমা একবার যেতে বললেন।'

'অবশ্যই।' উঠে দাঁড়াল অর্ক, 'চলুন।'

যাওয়ার আগে সে রামজির দিকে তাকাল। রামজি মাথা

অর্ক দেখল বাড়ির পূর্বদিকের বাগানে এখন ছায়া পড়েছে। সেই ছায়ায় চেয়ার পেতে বসে আছেন গুরুমা এবং একজন মহিলা। কিন্তু মহিলাকে দেখে শিষ্যা বা সন্ন্যাসিনী বলে মনে হল না। একটু রোগা কিন্তু যথেষ্ট ফর্সা এবং টানটান শরীর। অর্ক হেসে বলল, 'এখানে আসার পর সবসময় হুঁসে আছি যাতে আপনি ডাকলেই চলে আসতে পারি।'

নাড়ল।

মন্দিরের সামনে বসে কয়েকজন শিষ্য ধ্যান করছেন। অর্ক জিজ্ঞাসা করল, 'এই সময়ে ধ্যান? একটু আগেই তো দুপুরের খাওয়া শেষ হল?'

'ধ্যানের তো সময় অসময় নেই।' তরুণ শিষ্য পাশে হাঁটতে হাঁটতে বলল, 'গুরুমা বলেন যখনই ইচ্ছে হবে তখনই সময়। কিন্তু যাঁদের দেখছেন তাঁরা মধ্যাহ্ন ভোজন করেন না। সকালে সামান্য জলযোগ করে সন্ধেবেলায় রাতের আহার সারেন।'

অর্ক অবাক হল, 'মুসলমান বন্ধুরা তো রোজার সময় এই নিয়ম মেনে চলেন, তবে তাঁরা সকালে না ভোরের আগেই যা খাওয়ার খেয়ে নেন।' অর্ক বলল।

'গুরুমা বলেন, মাঝে মাঝে ঈশ্বরের আরাধনায় শরীর অভুক্ত রাখলে কোনও ক্ষতি হয় না, স্বাস্থ্যের উপকার হয়।' তরুণ শিষ্য বলল।

'বাঃ, আপনি দেখছি চমৎকার জ্ঞান লাভ করেছেন।'

'না না। আমি অতি সামান্য। গুরুমার কৃপা পেলে ধন্য হয়ে যাব।' সেই বৃদ্ধ শিষ্য অপেক্ষা করছিলেন। হেসে বললেন, 'ওকে বিশ্রাম থেকে টেনে নিয়ে আসেননি তো?'

অর্ক বলল, 'না না। আমি তো বসেই ছিলাম।'

'আসুন আমার কক্ষে।' বৃদ্ধ শিষ্য পেছন ফিরতেই তরুণ শিষ্য যেদিক থেকে এসেছিল সেদিকে চলে গেল। অর্ক বুঝতে পারল এই আশ্রমে ডিসিপ্লিন মেনে চলে সবাই।

ভেতরের বারান্দার কাছে গিয়ে বৃদ্ধ শিষ্য বললেন, 'গুরুমা ওই বাগানে অপেক্ষা করছেন, যান।'

অর্থাৎ এখন তাঁর ওই পর্যন্ত যাওয়ার অধিকার তা তিনি জানেন। অর্ক এগিয়ে বারান্দায় দাঁড়াতেই শুনতে পেল, 'এই যে এসে গেছ।'

অর্ক দেখল বাড়ির পূর্বদিকের বাগানে এখন ছায়া পড়েছে। সেই ছায়ায় চেয়ার পেতে বসে আছেন গুরুমা এবং একজন মহিলা। কিন্তু মহিলাকে দেখে শিষ্যা বা সন্ন্যাসিনী বলে মনে হল না। একটু রোগা কিন্তু যথেষ্ট ফর্সা এবং টানটান শরীর। অর্ক হেসে বলল, 'এখানে আসার পর সবসময় হুঁসে আছি যাতে আপনি ডাকলেই চলে আসতে পারি।'

'ও মা? তাই! বেশ বলো, মানুষ কেন পৃথিবীতে আসে?'

অর্ক বলল, 'মার্জনা করবেন যদি ধৃষ্টতা দেখাই। মানুষ তো নিজের ইচ্ছেয় পৃথিবীতে আসে না।'

গুরুমা কিছুক্ষণ তাকালেন, তারপর বললেন, 'বসো।'

অর্ক নিঃশব্দে তৃতীয় চেয়ারে বসল।

গুরুমা জিজ্ঞাসা করলেন, 'একসময় মানুষের জীবন ফুরিয়ে যায়। এই আসা-যাওয়া কী কারণে? অন্য প্রাণীদের সঙ্গে তফাত কোথায়?'

অর্ক বলল, 'তফাত একটাই, মানুষ দাগ রেখে যেতে পারে, অন্য প্রাণী পারে না।'

জোরে হেসে উঠলেন গুরুমা, 'বাঃ। খুব ভালো। তুমি দেখছি পড়াশোনা করেছ।'

'কিছুই পড়িনি। মায়ের কাছে ওঁর লেখা বই ছিল, তাই—।' অর্ক বলল।

এবার গুরুমা মহিলার দিকে তাকালেন, 'এই মেয়ে, তুমি যাকে দেখতে চেয়েছিলে সে এই!'

মহিলা তার দিকে তাকাতেই অর্ক হাত জোড় করল, 'আমি অর্ক মিত্র।'

'আমি কুন্তী সেন। নমস্কার।' হাত জোড় করলেন মহিলা। তারপর একটু থেমে বললেন, 'আপনার নামটা সচরাচর শোনা যায় না। কিন্তু আমি আগে শুনেছিলাম বাবার মুখে। তাই আপনাকে দেখার কৌতূহল হল। অবশ্য বাবা যে অর্কের কথা

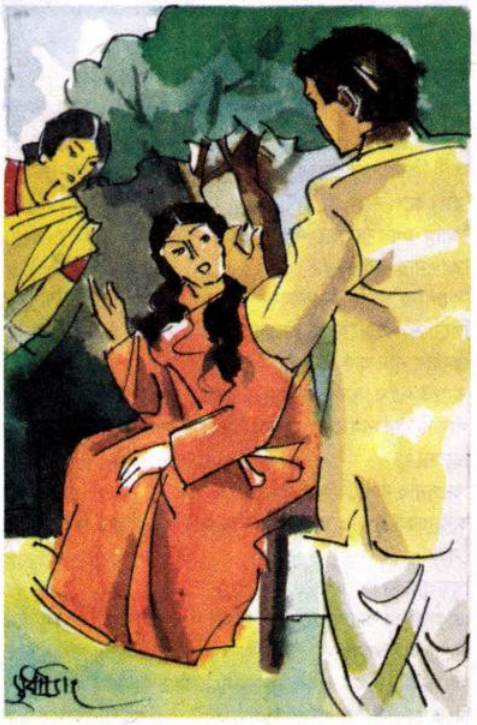

'আপনারা কি বহুদিন কলকাতায় আছেন?' কুন্তী জিজ্ঞাসা করল। 'কিছু মনে করবেন না, আপনি বললেন আপনার বাবা একাত্তরের আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন। আমার বাবাও এম-এ পরীক্ষা দিয়ে সেই আন্দোলনে শামিল হয়েছিলেন।'

বলেছিলেন তিনি অন্য কেউ হওয়াই স্বাভাবিক।'

গুরুমা হাসলেন, 'নাম শুনে ব্যস্ত হয়ে উঠল মেয়ে, বলল দেখতে চাই।'

কুন্তী জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি কি কলকাতায় থাকেন?'

'হ্যাঁ। আপনি?'

'আমি এখন ব্যান্ডেলে থাকি, স্কুলে পড়াই।'

'আপনার বাবা—।'

'কলেজে পড়াতেন। অবসর নিয়েছিলেন। ছ'বছর আগে মারা গিয়েছেন হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে। বাবার এক সহযোগীর ছেলের নাম অর্ক।'

'হতেই পারে। আমি একজন আইএএস অফিসারের নাম কাগজে পড়েছি যাঁর নাম অর্কপ্রভ দেব। তিনি অবশ্য আমার বাবার বয়সি ছিলেন?'

'আপনার বাবা কি করতেন?'

অর্ক একটু চুপ করে বলল, 'কিছু না। কিছু করার ক্ষমতা তার নেই।'

'বুঝলাম না।'

'একাত্তরের আন্দোলনে ধরা পড়ার পর পুলিশ তাকে পঙ্গু করে দিয়েছিল। অনেকদিন জেলে থাকার পর বেরিয়ে এসেও হাঁটতে পারেননি। এখন অবশ্য ক্রাচ নিয়ে হাঁটেন।' অর্ক গুরুমায়ের দিকে তাকাল, 'আপনার এখানে সবাই এত শৃঙ্খলা মেনে চলেন যা বাইরে বেশি দেখা যায় না।'

'তাই বুঝি।' গুরুমা হাসলেন, 'ওরা সবাই খুব ভালো। কতবার এখানে পুলিশ এসে দেখতে চেয়েছে ওদের মধ্যে কেউ ছদ্মবেশে লুকিয়ে আছে কি না। না পেয়ে খুব হতাশ হয়েছে। জেলাশাসক এসে অবশ্য দুঃখ প্রকাশ করে গিয়েছেন।'

'ছদ্মবেশে কারা লুকিয়ে আছে বলে ওরা ভেবেছিল?'

'ওই যারা মনে করে যেভাবে দেশ চলছে সেভাবে চললে গরিব মানুষরা আরও গরিব হবে। তাই তারা উগ্র পথ ধরেছে।' গুরুমা বললেন, 'আমি বলি শরীরে যদি টিউমার তৈরি হয় তাহলে ছুরি চালিয়ে সেটা বাদ দিলেই তো সেরে যাবে না, আবার একটা জায়গায় সেটা মুখ তুলবে। অসুখটা সারাতে ঠিকঠাক ওষুধ দিতে হবে শরীরে। ভেতর থেকে রোগটাকে নির্মূল না করলে রোগ সারে!'

অর্ক মুগ্ধ হল কথাটা শুনে। কিন্তু ভেতর থেকে নির্মূল করার জন্যে যে ওষুধ দরকার তা কি প্রশাসনের কাছে আছে! সে কিছু বলল না।

'আপনারা কি বহুদিন কলকাতায় আছেন?' কুন্তী জিজ্ঞাসা করল। 'কিছু মনে করবেন না, আপনি বললেন আপনার বাবা একাত্তরের আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন। আমার বাবাও এম-এ পরীক্ষা দিয়ে সেই আন্দোলনে শামিল হয়েছিলেন। বছর খানেক জেলেও ছিলেন। পরে বামফ্রন্ট ক্ষমতায় আসার পরে উনি

সরকারি কলেজে চাকরি পান।'
'কোন জেলে ছিলেন?'
'বহরমপুরে।'
'কী নাম ওঁর?'
'অবনী সেন।' কুন্তী বললেন, 'সিপিএম থেকে ওকে প্রস্তাব দিয়েছিল দলের হয়ে কাজ করতে কিন্তু উনি রাজি হননি।'
অর্ক গুরুমায়ের দিকে তাকাল, 'আচ্ছা, আপনি তো আমাদের সম্পর্কে কিছুই না জেনে আশ্রয় দিয়েছেন। পুলিশ যদি এখন এসে আমাদের ধরে আপনার কৈফিয়ত চায় তাহলে কী বলবেন?'
'পুলিশের মুখোমুখি যদি হতে না চাও তাহলে আমার বিশ্বাস তোমরা আমাকে অপদস্থ করবে না। ওই অজয় নদের ওপারের জঙ্গলে স্বচ্ছন্দে চলে যেতে পারবে। তবে পুলিশ চলে যাওয়ার পর যদি এখানে তোমরা ফিরে আসো তখন তোমাদের থাকতে দেওয়ার ব্যাপারে আমাকে ভাবতে হবে। সকালে তোমাকে বলেছিলাম অজয়ের ধারে ঘুরে দেখে আসতে। ইচ্ছে হলে দেখে এসো।' গুরুমা উঠলেন, 'এবার আমাকে তৈরি হতে হবে। তোমরা আসতে পারো। কুন্তী, তুমি আজই ফিরে যেতে চাইছ?'
'হ্যাঁ। বোলপুরের এক বান্ধবীর বাড়িতে রাত্রে থাকব।'
'দ্যাখো। যদি মনে করো, এখানেও থাকতে পারো। আমার এই এখানে।' গুরুমা সামনের ঘরটি আঙুল তুলে দেখিয়ে ভেতরে চলে গেলেন।
রোদ মরে আসছে। অর্ক বলল, 'আচ্ছা, চলি।'
কুন্তী বললেন, 'একটু দাঁড়ান, আপনার বাবার নাম কি অনিমেষ?'
'হ্যাঁ। আপনার বাবা তাহলে আমার বাবাকে চিনতেন?'
'নিশ্চয়ই। বাবার কাছে আপনার মায়ের কথাও শুনেছি। প্রচুর স্যাক্রিফাইস করেছেন মহিলা।' কুন্তী বললেন।
অর্ক কিছু বলল না।
'আর তাহলে আপনিই সেই অর্ক।' কুন্তী হাসলেন।
'পৃথিবী খুব ছোট জায়গা।'
'তাই তো দেখছি। পনেরো-ষোলো বছরে শোনা গল্পটা আজ আপনাকে দেখে নতুন করে মনে পড়ছে। খুব ভালো লাগছে।'
অর্ক তাকাল, 'আপনি কি গুরুমায়ের শিষ্যা?'
'আমি?' বুকে আঙুল রেখে মাথা নাড়লেন কুন্তী, 'প্রথাগত দীক্ষা নিয়ে শিষ্যা আমি হইনি। কোনও কোনও মানুষ যখন কথা বলেন তখন শুনলে ভেতরটা পরিষ্কার হয়ে যায়। এক অর্থে তিনি নিশ্চয়ই গুরু হয়ে যান। এরকম গুরু আমার কয়েকজন আছেন। তাঁদের আমি চোখেও দেখিনি।'
'যেমন?'
'রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ, কার্ল মার্কস।'
'সে কী? ওই দু'জনের পাশে কার্ল মার্কস?'
'কেন নয়? আপনি দাস ক্যাপিটাল পড়েছেন?'

'না। আমি এখন অজয় নদের চরে যেতে চাই। গুরুমা আমাকে বেশ কয়েকবার ওখানে যাওয়ার কথা বলেছেন, আচ্ছা, এলাম।' অর্ক ঘর পেরিয়ে বাইরে আসতেই বৃদ্ধ শিষ্যাকে দেখতে পেল। ইতিমধ্যে তাঁর পোশাকের পরিবর্তন হয়েছে। গেরুয়া পাঞ্জাবি এবং লুঙ্গিতে তাঁকে ঈশ্বরভক্ত বলেই মনে হচ্ছিল। বললেন, 'প্রার্থনার পর এখানে চা এবং সামান্য জলযোগের ব্যবস্থা করা হয়।

'না।'

'তাহলে এই আলোচনা থাক।' কুন্তী বললেন, 'আমি মাঝে মাঝে বোলপুরে আসি। যখনই আসি তখনই একবার এই আশ্রমে এসে গুরুমায়ের সঙ্গে দেখা করে যাই। ওঁর অতীত আমি জানি না, জানতেও চাই না। কিন্তু এলে ভালো লাগে। আজ আমি এখান থেকে ব্যান্ডেলে ফিরে যাব।'

অর্ক বলল, 'আচ্ছা! তাহলে এখন চলি।'

'আপনি কি প্রার্থনাতে যোগ দিচ্ছেন?'

'প্রার্থনা?'

'মন্দিরের সামনে সবাই একত্রিত হন। পুজো শুরুর আগে গুরুমাকে সামনে রেখে কিছুক্ষণ ধ্যান করেন। তারপর গুরুমা উপদেশ দেওয়ার পর নিজের হাতে মায়ের পুজো করেন। ওই পুরো ব্যাপারটাকেই এখানে প্রার্থনা বলা হয়।'

'না। আমি এখন অজয় নদের চরে যেতে চাই। গুরুমা আমাকে বেশ কয়েকবার ওখানে যাওয়ার কথা বলেছেন, আচ্ছা, এলাম।' অর্ক ঘর পেরিয়ে বাইরে আসতেই বৃদ্ধ শিষ্যাকে দেখতে পেল। ইতিমধ্যে তাঁর পোশাকের পরিবর্তন হয়েছে। গেরুয়া পাঞ্জাবি এবং লুঙ্গিতে তাঁকে ঈশ্বরভক্ত বলেই মনে হচ্ছিল। বললেন, 'প্রার্থনার পর এখানে চা এবং সামান্য জলযোগের ব্যবস্থা করা হয়। দূর থেকেই ঘণ্টার ধ্বনি শুনতে পাবেন। অন্য সময় এক দু'বার বাজলেও সে সময় পরপর সাতবার বাজবে।'

মাথা নেড়ে এগিয়ে যেতেই অর্ক তরুণ শিষ্যকে দেখতে পেল। বেচারা সম্ভবত তখন থেকে এখানেই অপেক্ষা করছিল। দু'বার ঘণ্টাধ্বনি হতে অর্ক জিজ্ঞাসা করল, 'এখনই প্রার্থনা আরম্ভ হবে?'

'হ্যাঁ, সবাই মন্দিরে পৌঁছে গিয়েছেন। অতিথিরাও অংশ নিতে পারেন। আপনি কি সেখানে যাবেন না ঘরে ফিরবেন?'

'ঘরেই ফিরব।'

অর্ককে পৌঁছে দিয়ে তরুণ শিষ্য দ্রুত চলে গেল প্রার্থনায় যোগ দিতে। এই যে ছেলেটি তাকে একটা সীমা পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছিল এবং আবার ফিরিয়ে আনল, এটা নিশ্চয়ই স্ব-ইচ্ছায় করেনি। তাহলে কি আশ্রমের মধ্যে বহিরাগতদের চলাফেরা এঁরা নিয়ন্ত্রণে রাখতে চান? এখানকার শেষ কথা যখন গুরুমাই বলেন তখন নির্দেশটা তাঁরই। কেন?

রামজিকে ঘুম থেকে তুলল অর্ক। বলল, 'চলুন নদীর চরে যাব।' এখন রামজি অনেকটা চাঙ্গা। বাইরে বেরিয়ে এসে বলল, 'ঘুমটা দরকার ছিল।'

অর্ক রসিকতা করল, 'যে কাজে এসেছেন তাতে কি এভাবে ঘুমোনোর সুযোগ পাবেন? এখান থেকেই তো ছুটতে হবে সুন্দরবনে।'

হাঁটতে হাঁটতে রামজি বলল, 'যতদূর জানি সেখানে তো খাল আর তার পর সমুদ্র। কুমির আর বাঘ আছে প্রচুর। মুশকিল হল আমি সাঁতার জানি না।'

'জেনেও কোনও লাভ হত না। সুন্দরবনের নদী বা খালে সাঁতরানো যায় না।'

অর্ক নদীর ধারে এসে দাঁড়াল। যতই অজয়কে নদ বলা হোক অন্যমনস্ক মন নদীই বলে চেনে। এদেশের যাবতীয় নদীর নাম স্ত্রীলিঙ্গের পরিচায়ক, পুরুষ নাম হলেই নদ হয়ে যায়। কোনও মানে হয় না।

ওরা চরে নামল। রুপোলি বালির ওপর দিয়ে বিকেলের বাতাস বইছে, খানিকটা হাঁটার পর জলের ধারা। কোথাও হাঁটুর ওপরে কোথাও গোড়ালি ডোবা। ওরা জায়গা বেছে নিয়ে জল পেরিয়ে আবার বালির চরে আসতেই খানিকটা দূরে দুটো শেয়াল তাদের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। অর্ক হেসে ফেলল।

'হাসছেন কেন?' রামজি জিজ্ঞাসা করল।

'জলপাইগুড়িতে আমার ঠাকুমার পোষা শেয়াল আছে।'

'শেয়াল পোষ মানে?'

'তাই তো দেখে এলাম।' বলতে বলতে অর্ক দেখতে পেল আশ্রমের দিক থেকে কেউ একজন দু'হাতে জিনিস নিয়ে দৌড়ে এদিকে আসছে। চিৎকার করছে লোকটা। আর একটু কাছে আসতেই চিনতে পারল অর্ক, সেই তরুণ শিষ্য হাঁপাতে হাঁপাতে আসছে, দু'হাতে ওদের দু'জনের ব্যাগ। জল পেরিয়ে এসে সে একটু দম নিয়ে বলল, 'আপনারা তাড়াতাড়ি ওই জঙ্গলের ভেতর চলে যান।'

'কেন?'

'খবর এসেছে পুলিশ আবার সার্চ করতে আসছে।' ছেলেটি শ্বাস ফেলছিল দ্রুত, 'ওই জঙ্গলের ভেতর দিয়ে দুই মাইল গেলে বর্ধমানের রাস্তা পেয়ে যাবেন, পুলিশ চলে গেলে কুন্তীদিদি ওই রাস্তায় গাড়ি নিয়ে যাবেন। আমি চলি। পুলিশ আসার আগেই আশ্রমে ফিরতে হবে।' তরুণ শিষ্য যেভাবে এসেছিল সেইভাবে ছুটে যাওয়ার চেষ্টা করল, যদিও এখন গতি অনেক কম।

দ্রুত বালির চর ভেঙে ওরা জঙ্গলে ঢুকে গেল। তারপর ঘুরে দেখল ছেলেটি তখনও ওপারে পৌঁছায়নি। রামজি জিজ্ঞাসা করল, 'পুলিশ কী করে আমাদের কথা জানতে পারল? তার মানে ওদের চর আমাদের সঙ্গে সঙ্গে কলকাতা থেকে এখানে এসেছে?'

'না। তা হতে পারে না। আশ্রমের কেউ নিশ্চয়ই পুলিশকে জানিয়েছে। কিংবা আমরা আশ্রমে ঢোকার আগে লোকাল লোক

যারা দেখেছিল তাদের মধ্যে পুলিশের ইনফর্মার ছিল। আবার দেখুন, পুলিশের কেউ আশ্রমে খবরটা পৌঁছে দিয়েছে বলে ছেলেটা দৌড়ে এল। চলুন, হাঁটা যাক। পুলিশ আমাদের ওখানে না পেলে নিশ্চয়ই নদীর এপাশে আসবে।' অর্ক হাঁটতে শুরু করল।

'আজ একটু পরে তো সব অন্ধকারে ঢেকে যাবে, কোথায় খুঁজবে ওরা।' রামজি হাসল, 'অন্ধকার ঘন হওয়ার আগেই আমরা যতটা পারি এগিয়ে যাই।'

এই জঙ্গল ঘন নয়। মাঝে মাঝে কিছু বড় গাছ থাকলেও বেশিরভাগ জায়গায় ঝোপ এবং লতানো গাছের জঙ্গল অবশ্য ওরা একটা পায়ে চলা পথ পেয়ে হাঁটতে সুবিধে হচ্ছিল।

কিন্তু সেই সমস্ত চরাচর অন্ধকারে ডুবে গেল, শিয়ালগুলো ডেকে উঠল সমস্বরে, সন্ধ্যাতারা লাফিয়ে উঠল আকাশের কোনায় অমনি ওরা দাঁড়িয়ে গেল। অর্ক জিজ্ঞাসা করল, 'আপনার কাছে কি টর্চ আছে?'

'না। পায়ে হাঁটি, চলুন।'

'কিন্তু এই পায়ে হাঁটা পথ যে বর্ধমানের রাস্তার দিকে যাচ্ছে তার নিশ্চয়তা কী?'

'তা ঠিক। তাহলে এক কাজ করি। এখানেই রাতটা কাটিয়ে ভোরের জন্যে অপেক্ষা করি।' রামজি বলল।

'সেটা ঠিক হবে না। দিনের আলোয় জঙ্গল থেকে বের হলে যে কেউ সন্দেহ করবে। চলুন।' অর্ক এগোল। মাঝেমাঝেই ঝোপের পাতায় শরীরে জ্বলুনি ধরছিল। রাত দশটা নাগাদ ওরা জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এসে অজয় নদের পাশ দিয়ে হাঁটতে শুরু করল। কিছুক্ষণ পরে দূরে গুমগুম আওয়াজ শুনে তাকিয়ে দেখল একটা সেতুর ওপর দিয়ে ট্রেন চলে যাচ্ছে।

কাছে এলে ওরা পাশাপাশি গাড়ি চলার সেতুটাকে দেখতে পেয়ে রাস্তার ওপর উঠে গাছের আড়ালে গিয়ে দাঁড়াল। অর্ক বলল, 'এই দিকটা দিয়ে গেলে বর্ধমানে পৌঁছোনো যাবে।'

'কতটা দূর?' রামজি জিজ্ঞাসা করল।

'বোলপুর অনেক কাছে। গেলে ঝুঁকি নিতে হবে।'

রামজি তাকাল। বোলপুরের দিক থেকে একটা বড় গাড়ি আসছে। তার হেড লাইটের আলো বেশ তীব্র। রামজি দ্রুত রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে হাত নাড়তে লাগল ওটাকে থামার জন্যে। গতি কমাচ্ছে না দেখে বাধ্য হয়ে সরে এল সে। অর্ক বলল, 'কেউ থামবে না ডাকাতির ভয়ে।'

'তাহলে?'

'যা হওয়ার তা হবে। চলুন বোলপুরের দিকেই হাঁটি।'

ওরা মিনিট পনেরো হাঁটার পর রাস্তার ধারে একটা গাড়িকে হেডলাইট জ্বালিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল। সামনের সিটে একজন ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলা বসে। অর্করা শুনল, হঠাৎ গাড়িটার স্টার্ট বন্ধ হয়ে গিয়েছে। ভদ্রলোক গাড়ির মেকানিজম জানেন না। সঙ্গে সঙ্গে রামজি বনেট তুলে পরীক্ষা শুরু করলে অর্ক বলল, 'গাড়ি ঠিক হয়ে গেলে আমাদের বর্ধমান পর্যন্ত লিফট দেবেন?'

ভদ্রলোক উত্তর দেওয়ার আগেই ভদ্রমহিলা বললেন, 'নিশ্চয়ই দেব।'

ক্রমশ

অলঙ্করণ: যুধাজিৎ সেনগুপ্ত

এই শ্রাবণের কথা

অনুরাধা মহাপাত্র

ভিজে যাওয়া ঝরঝর বৃষ্টির অপরাজিতার নীলাঞ্জন
সাথি, দারুণ বজ্রাঘাতে মরে মরে এখনও ভুলিনি
নীলমণিফুলের মতো একাগ্রতা সে যেন পেয়েছে।
সাথি অপমানে দগ্ধ হতে হতে তবু, হৃদয়ে রেখেছি।

নতুন ভ্রমণ আসে আর নব নব রূপনারায়ণ তীর
নীল ইন্দিবরা সাথি, নব সরস্বতী, হাতে নব ইতিহাস
ঘাসে ঘাসে পুড়ে পুড়ে সংগ্রামের নব রূপকথা
রচনা করেছি সাথি, তোর মুখে নতুন আকাশ

সাথি, তুই-আমি-তাহারা কি চিরকাল
মৃগি রয়ে যাবো? বাঁশে বয়ে দুই হাত, দুই পা উপরে
রাজনীতির নাম দিয়ে নারী বধ হবে বার বার
সাথি, আয় তবে, এ-মৃগিজন্ম আজ মুছে ফেলা যাক।

সাথি তোর রক্তমাখা বুকের কাঁটায় তবে
লেখা থাক অনাদিকালের হিম অনাথ রোদন
মুছে যাওয়া কামিনীফুলের ঢলে চেতনার ভার
শূন্যরূপা রক্তাভ চাঁদ উঠছে অবচেতনের কপালে আবার।

চূর্ণি

শাশ্বত কর

খন্ডগ্রাস নদীজল ছুঁলে সন্ধেরা আঁচ দেয়
জোলো খেতে, সূর্যের আবেগেরা চাপ ধোঁয়া হয়ে ইথারে শঙ্কু হয়
তখন পানকৌড়ি ঠোঁট মোছে পালকের নীচে রাখা তোয়ালেতে
আর লালগোলার বাঙ্কে কোঁচড়িয়া বিছানায় কচমচে মুড়ির দল ঝলসিয়ে ওঠে

এখনও তো সেইসব কিছুই হল না
এখনও তো তার বেয়ে চা খেতে ডাকল না বউ

তবু...

তুমি এখনই গুটিয়ে নিলে এলানো আঁচল?
রাত ছোঁবে বলে এখনই গুছিয়ে নিলে বুক?
কাঁচুলিতে আঁট দিয়ে এখনই নিস্তরঙ্গ হলে?

আলুথালু পাহাড়ি ভ্যালিতে ঝিকঝিক
জানলার গ্রিলে যখন লাল বল ড্রপ খায়
তখন মনখারাপি মেঘেদের দখল নেব বলে আমি যে
পাঁচ মেগা পিক্সেল তাক করেছি তোমার দিকেই

প্রাচীন অরণ্যপ্রবাদ

সঞ্জীব নিয়োগী

নধর দরাদরি রাতজাগা সকালের ঢেউ: আজ মনে পড়ছে শতছেঁড়া মশারির ঘাম...এরকম টিকাটিপ্পনী সহ শুয়ে থাকতে, গেঁজানো ভাতের নগণ্য কাক... ফিল গুড হামা ছেড়ে ধরতে চাচ্ছ কাঁটাতারের হাওয়া। কিস্তির দোকানগুলো পেরিয়ে শব্দ শিখছ আর উচ্চারণ করছ আয়নার উল্টোপিঠে...এভাবে প্রচ্ছদের রং নিয়ে ভাবনা চিন্তার হাসি; রাত পোহালে সকাল, দুপুর গড়ালে বাতি: বিরামচিহ্নের নদী-সমান্তর ভারাক্রান্ত মুক্তিবেগ দিলদরিয়া টিকে থাকার হাতছানি...

দুটি কবিতা

হিন্দোল ভট্টাচার্য

ফতোয়া

অবসর নেওয়া এক বুড়ো কুকুরের মতো আমি
তবুও কোথাও যাই না, অপমান এমনই মহান
আমার আসল মুখ দেখতে পাওনি, শোনো ভগবান
ভিতরে কান্নাই ঝরে, বাইরে হিংসা, প্রচণ্ড আগুন...
বিশ্বাসঘাতক ভাব, অথচ আমি তো সামান্যই
ধূপধুনো জ্বালিয়ে বসে আছি এই মহান শ্মশানে!

কর্পোরেট

তুমি বড় হয়ে ওঠো, তোমাকে রক্তাক্ত কার্পেটের
অভিবাদনের ভাষা শোনাব যখন চলে যাব;
এখনও যাওয়ার দিন আসেনি আমার তাই হাতে
রেখেছি সুতীক্ষ্ণ ছুরি, বর্ম আজ, যেটুকু আমার।
শাস্তি তো নিজের চেয়ে আর কেউ নিজেকে দেয় না...
আমারও ঘনিয়ে এল বয়সের মুন্সিয়ানাগুলো।

ঘুমঘোর

কৌশিক বিশ্বাস

ভাগাভাগি করে জ্যোৎস্না নিয়েছি জানিস
ধুয়ে মুছে গেলে নাও মানতে পারিস

তোর জন্য জমানো যেসব প্রশ্রয় রাখা ছিল
নষ্ট জীবন, কুকুর জীবন একবারই ঝলসাল

ঘুম চোখে তোকে মেখে রেখে শুই রোজ
অসাবধানির রাত স্লিপিং পিলের ডোজ

সিপিয়া টোন-এ আগোছালো প্রেম ধরে রাখি
তুই আর আমি
আর
জ্যোৎস্না মাখামাখি।

জৈবনিক

মাসুদ খান

কেশরহাঁকানো কোনও বলিষ্ঠ ঘোড়ার
দ্বিভঙ্গ-দাঁড়ানোভঙ্গি ঘুমের ভেতর ডুব দিয়ে বহুদূর গিয়ে
ভুস করে ভেসে উঠব শুশুকের ভেজা-ভেজা স্বপ্নের ভেতর।

ওইদিকে, নদীতীরে, কী-কী সব কুহককীর্তন করতে করতে
পুরাতন গাছে উড়ে এসে বসবে আধুনিক পাখি, আধুনিক প্রজাপতি।

সজারুর কাঁটাকাঁটা উপলব্ধি নিয়ে
জানবাজি জেগে থাকতে হবে নিদ্রাহীন
সম্ভবত আরও একটি সম্পূর্ণ বছর...

অলঙ্করণ: দেবযানী রায় ঘোষাল

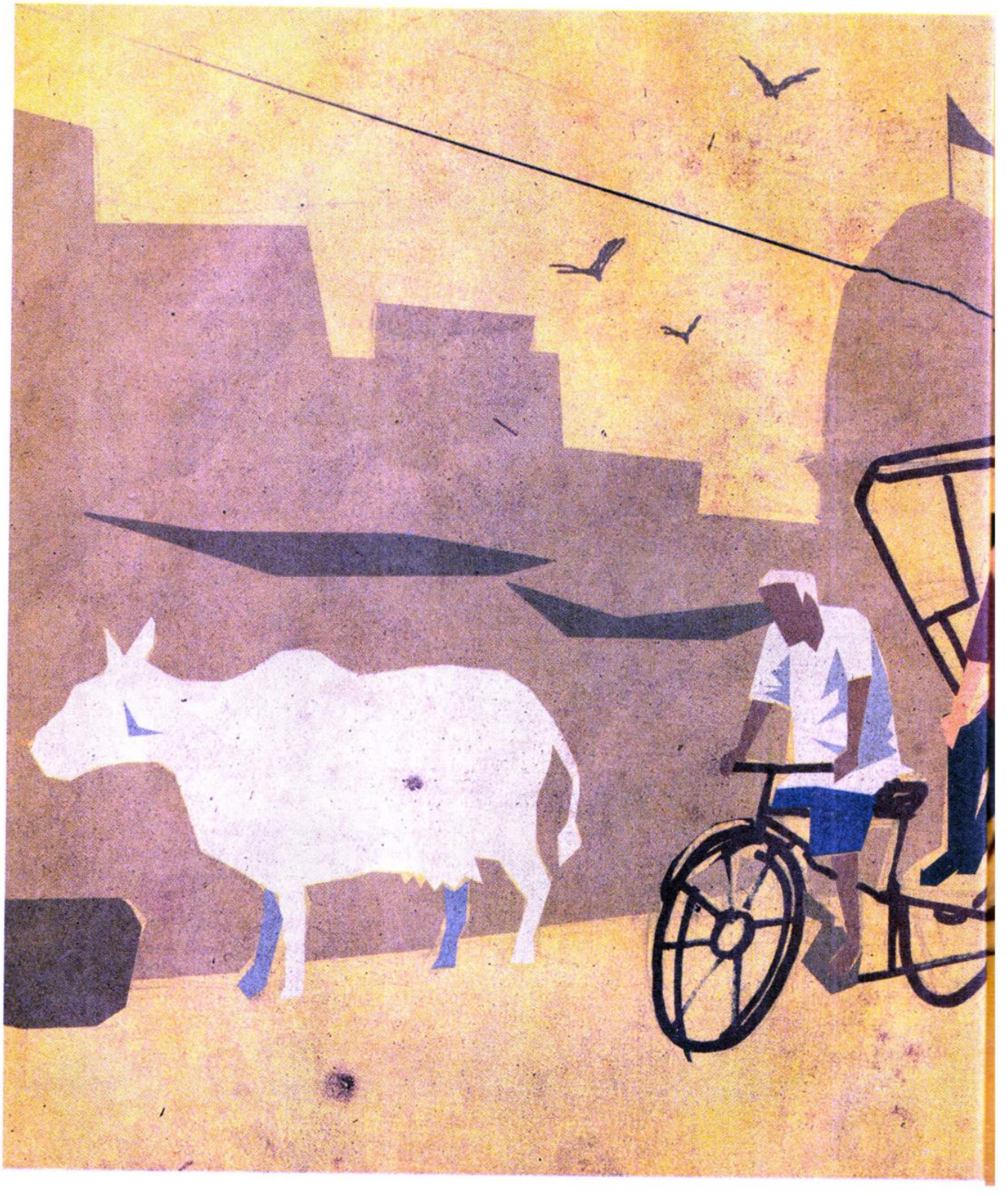

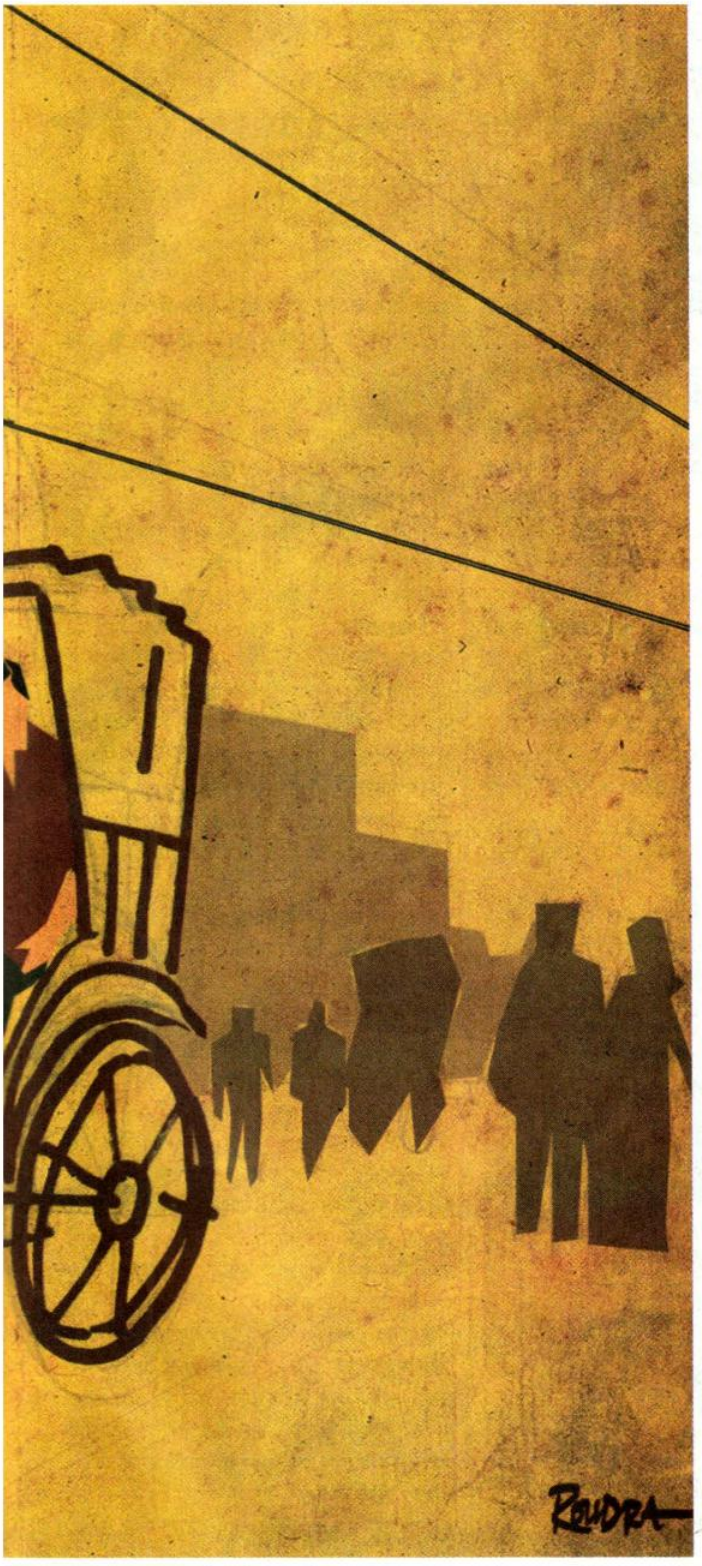

বাঁচা-মরার মাঝখানে

বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়

।। ৮ ।।

আর ছোট মেয়েটি? অল্প কোঁকড়ানো চুল, বেশ ফরসা, চাপা নাকের সেই মেয়েটি, যার মুখ সন্ধ্যা রায়ের স্মৃতিকে উসকে তোলে মাঝেমধ্যে কিন্তু শরীরের খাঁজে খাঁজে উত্তাল পলির ছোঁয়ায় লতিয়ে ওঠা একটা বুনো সেক্স অ্যাপিলের কারণে যাকে প্রীতি জিন্টার দূরসম্পর্কের বোন বলেও চালিয়ে দেওয়া যায়, যার হাসিটা কেবলমাত্র চারপাশ আলো করে দেয় না, ওই হাসির তালে উপচে ওঠা শরীরী জোয়ারের জন্য যাকে দলাই-মলাই করতে ইচ্ছে করে সেইসব মুহূর্তে, বুকে নিয়ে পিষে ফেলতে ইচ্ছে যায়, আসলে সেই মেয়েটা কেমন? তার গালে টোল পড়ে না বলে তার যে দুঃখ সেটা কি আসল নাকি বানানো? অত অত কষ্টের ভিতর দিয়ে বড় হয়ে ওঠার পরও এমন নিটোল ফিগার যার তার কি সত্যিই অভাববোধ আছে গালের টোলের জন্য? নাকি স্রেফ ন্যাকামি, যাকে মেয়েদের লাবণ্য বলে মনে করে সমাজ?

শিয়ালদা থেকে একঘণ্টা পাঁট মিনিটের দূরত্বে নৈহাটি স্টেশনে নেমে পায়ে হেঁটে লাইন ক্রস করে একটা রিকশায় উঠে যখন বলেছিল, 'লোহারঘাট যাব' তখনও কি প্রলয়ের সম্যক ধারণা ছিল ও কোথায় আসছে? এস মিত্র রোড, লোহাঘাট—কে এই লোহাঘাটের মিত্তিরমশাই? প্রলয়ের কোনও দূরসম্পর্কের আত্মীয় নিশ্চয়ই নন। রিকশাটা শেষ বাঁক নেওয়ার সময় ও দেখেছিল একটা খোলা ভ্যাটের সামনে দুটো শুয়োর ঘোঁতঘোঁত করে তেড়ে যাচ্ছে এ ওর দিকে আর তার পাঁচ-পা দূরে একটা টিউকলের নীচে সায়া ব্লাউজ পরা এক মহিলা, যার গোটা মুখটাই সাবানের ফেনায় আল্পস হয়ে আছে, তারস্বরে হিন্দিতে গালাগালি করছে একটা বাচ্চাকে।

—কেন গালাগাল করছে বাচ্চাটাকে? কৌতূহলী হয়ে রিকশাওয়ালাকে জিজ্ঞেস করেছিল প্রলয়।

রিকশাওয়ালা গভীর অবজ্ঞার সঙ্গে জবাব দিয়েছিল, ভালো করে কল টিপতে পারছে না।

আর কিছু বলেনি প্রলয়। কিন্তু একটা গভীর বিরক্তিতে ছেয়ে গিয়েছিল ওর মন।

কিন্তু ওই গঙ্গা, বাড়ির পঞ্চাশ হাত দূরের ওই গঙ্গা যেন মুহূর্তের মধ্যে হোয়াইটওয়াশ করে নতুন রং লাগিয়ে দিল সবকিছুর ওপর। নীল রঙের

আসলে মাথাই কাজ করছিল না তখন। না ওর, না কমলিনীর। কাজ করছিল দুটো জাগ্রত শরীর, কাজ করছিল প্রলয়ের ঠোঁটের ভিতর কমলিনীর ঠোঁট আর কাজ করছিল দুটো জিভ যারা প্রলয় আর কমলিনীর সমস্ত কথা মিলিয়ে দিচ্ছিল নীরবতায়, কথাকে বদলে দিচ্ছিল কবিতায়। প্রলয় ওর ঠোঁট নামিয়ে আনছিল কমলিনীর গলায়, নামতে চাইছিল আরও নীচে।

একটা স্কার্টের ওপরে সাদা আর গোলাপি মেশানো একটা ফুলছাপ টপ পরে কমলিনী যখন ওর সামনে এসে দাঁড়াল, প্রলয়ের আনা মিষ্টির সঙ্গে ঘরের পাঁপড় আর গাছের পেয়ারা প্লেটে ধরে, ইচ্ছে করল ওকে খুব আদর করতে। ফেনায় ফেনায় কমলিনীর মুখও একটা আল্পসের নীচে ঢাকা পড়ে যাচ্ছে আর সেই ফেনার পিছনের সাবানটা কমলিনীর মুখে প্রলয়ই ঘষছে এমন একটা দৃশ্য ওর চোখের সামনে ভেসে উঠল। আশ্চর্য একটু আগে যাকে কুৎসিততম বলে মনে হচ্ছিল, এখন তাকেই সুন্দর বলে ভাবতে কোথাও বাধছিল না ওর। কে ঘটাল এই পরিবর্তন? বাড়ির সামনের গঙ্গা? হ্যাঁ গঙ্গাই। কমলিনীর বাবা আর ও যখন ঘাটের বেশ কয়েকটা সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে দাঁড়িয়েছে, কমলিনী ছুটে এসে বলল, বাবা তোমার না হাঁটুতে ব্যথা?

কমলিনীর বাবা একগাল হেসে বললেন, সবসময় ব্যথার কথা ভাবতে নাই।

কমলিনী বলল, বেশ ভেব না। রাত্রে ব্যথা বাড়লে আমায় ডেকো না যেন। আমি স্টোভে জল গরম করতে পারব না।

প্রলয় একমুহূর্তের জন্য থমকে গেল। স্টোভে জল গরম করতে হবে কেন কমলিনীকে? ওদের গ্যাস নেই? নাকি মাসের শেষ বলে গ্যাস বাড়ন্ত? প্রশ্নটা ভিতরেই রেখে দিল ও। বাইরে আনল না। গঙ্গার গায়ে একটা জায়গা দেখিয়ে কমলিনী বললেন, ওটা একটা শ্মশান জানো তো।

—ওই শ্মশানটার বৈশিষ্ট্য কী বলে দাও, কমলিনী বলল।

—হ্যাঁ, ওইখানে কারওরে যদি পোড়ানো হয় তাহলে তার তিনদিনের মধ্যে অন্য একটা ডেডবডি ওখানে আসবই আসব।

—খুব ভয়ঙ্কর জায়গা। তুমি যদি ওর সামনে গিয়ে কিছুক্ষণ বসে থাকো তাহলে অমাবস্যার রাত্রে তোমায় ডাকবে। কমলিনী বেশ সিরিয়াস গলায় বলল।

—ডাকবে মানে? জ্যান্ত লোককে ডাকবে? প্রলয় সামান্য ঠাট্টার গলায় বলল।

—ডাকবেই তো। নিশির ডাক হয় জানো না? শোনেনি?

—আমি শুধু তোমার ডাক শুনেছি। গলাটা নিচু করে বলল প্রলয়। কমলিনী খিলখিল করে হেসে উঠল তারপর বলল, ওই গাছটা থেকে ফুল পেড়ে দাও না গো আমাকে।

প্রলয় লম্বা না হলেও লম্বার দিকে। ও নিজের গোড়ালির ওপর ভর দিয়ে নিজেকে আর একটু লম্বা করে ঝাঁকুনি দিল গাছটায়,বেশ জোরে। দু'তিনটে কদমফুল ঝরে পড়ল মাটিতে। তার একটা কুড়িয়ে নিয়ে কমলিনীর হাতে দেওয়ার সময় ওর একবার মনে হল কদম শব্দটা বাংলায় যতটা রোমান্টিক হিন্দিতে ততটাই যুদ্ধ-যুদ্ধ। কিন্তু এই তফাতটা ওকে আর কষ্ট দিল না তেমন। কোথায় কীভাবে যেন অনেক বড় একটা মেলানোর আয়োজনের ভিতর ঢুকে পড়েছিল ও।

দুপুরে কমলিনীর পড়ার টেবিলে-চেয়ার জড়ো করে যখন ওর খেতে বসার বন্দোবস্ত করা হচ্ছে ও নিজে গিয়ে সরিয়ে দিয়েছিল সেইসব। মাটির ওপর পেতে রাখা পিঁড়িটায় বসে পড়ে বলেছিল, আমি বিলেত থেকে আসিনি কাকিমা।

কমলিনীর মা একটু ইতস্তত করে বলেছিলেন, তোমার অসুবিধা হবে না?

—সুবিধে হবে বরং। বাড়িতে তো এভাবেই খাই। কথাটা সত্যি নয়। আবার পুরো মিথ্যেও নয়। সিউড়ির বাড়িতে টেবিল-চেয়ারে বসে খেলেও কোড্ডের বাড়িতে তো মাটিতে পিঁড়ি পেতে খাওয়াই অভ্যেস প্রলয়ের।

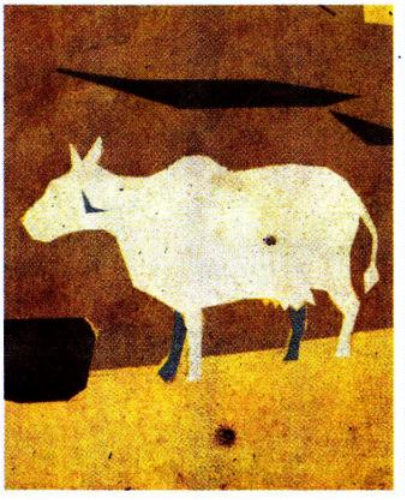

কমলিনীর মা তবু খানিকটা উশখুস করে মেয়েকে বললেন, ওকে ওই পিঁড়িটা দে বসতে। এটাতে তোর বাবা বসুক।

কমলিনী খুব নির্দোষ গলায় বলল, ওকে সবচেয়ে বড় পিঁড়িটা দেব কেন মা? ও কি আমাদের শত্রু?

কমলিনীর বাবা হো হো করে হেসে উঠলেন, এইবার মিসেস সোম জব্দ হয়েছেন।

মৃণালিনী চুপ করে রইলেন কিন্তু প্রলয়ের ভিতরে একটা প্লাস্টিকের পাখি জ্যান্ত হয়ে উঠল।

—কাকিমার নাম মৃণালিনী? বলে উঠল ও।

—হ্যাঁ। তোমায় বলিনি আমি? কমলিনী কলকলিয়ে উঠল।

কমলিনী বলেছে বলে মনে পড়ল না প্রলয়ের। তবু ও চুপ করে রইল। বঙ্কিমের শহরে, কবিপত্নী না হয়ে যারই বউ হোন, একজন মৃণালিনী তো আছেন। ভেবে ভালো লাগল ওর। আরও ভালো লাগল যখন ভাতের গায়ে আধ চামচ ঘি ঢেলে দিলেন কমলিনীর মা। প্রলয়ের মনে হল, এই এতক্ষণে নৈহাটির গায়ে গঙ্গা এসে পড়ল।

দুপুরে খাওয়াদাওয়ার পর একটু ঘুমিয়ে পড়েছিল প্রলয়। ওর ইচ্ছে ছিল দোতলার ঘরটায় গিয়ে শোয় তাহলে কমলিনী নিশ্চিন্তে কাছে এসে বসতে পারবে কিন্তু 'ওই ঘরে ধুলো-বালি ভরতি, ঝাঁট পড়ে না, ইঁদুর আরশোলা ঘুরছে' বলে কমলিনীর মা সেই ইচ্ছের মুখে ভেটো দিয়ে দিলেন। প্রলয় অগত্যা ওকে যে ঘরটা দেখিয়ে দেওয়া হল সেটাতেই শুল এসে। এই ঘরটা বাড়ির পিছন দিকে, জানলার পিছনেই একটা পেয়ারা গাছ আর জানলার পাশে একটা প্রায় শূন্য ড্রেসিংটেবিল। ঘরটার মাঝবরাবর দেয়াল থেকে দেয়াল একটা নাইলনের দড়ি টাঙানো তাতে কমলিনীর কুর্তি, পাজামা, ওড়না, অন্তর্বাসও, আর ওর মায়ের শাড়ি একখানা। ও ওই ঘরটায় গিয়ে বিছানাটার ওপর এলানো মাত্র বুঝতে পারল নীচে যেটা আছে সেটা খাট নয় চৌকি। প্রলয়ের শরীরের ভারে মড়মড় করে উঠল সেটা। ভেঙে ফেঙে যাবে না তো, সামান্য ভয় প্রলয়ের। কিন্তু গোটা বিছানাটায় কমলিনীর গায়ের গন্ধ এমন মাখামাখি হয়েছিল যে উঠতে ইচ্ছে করছিল না। পুরোনো দিনের বাড়ি, ওপরে তাকালেই কড়িবরগায় ঠেকে যায় চোখ,

স্যাঁতসেঁতে একটা গন্ধ উঠে আসে মেঝে থেকে, প্রলয়ের মনে হচ্ছিল এই পরিবারটা অ্যানিমিয়ায় ভুগছে। সেই অ্যানিমিয়া শুধু টাকার অভাবে নয়, স্বজন বন্ধুর অভাবও হয়তো সেই অ্যানিমিয়ার একটা কারণ। অন্তর্বাসগুলো নাইলনের দড়ি থেকে লুকিয়ে তুলে নিতে এসেছে কমলিনী যখন ওর চৌকির সামনে মেঝেতে বসে পড়ল, মায়ের কথা থেকে দিদির প্রসঙ্গে এসে কথা বলতে বলতে, কথা অসমাপ্ত রেখে চলে গেল দুম করে, প্রলয়ের মনে ধারণাটা বদ্ধমূল হয়ে উঠল আরও। কমলিনীরা একটা আতঙ্কের আবহাওয়ায় বাস করছে, বুঝতে পারল প্রলয়। কিন্তু সেই আতঙ্কের কারণগুলো মনের মধ্যে স্পষ্ট হওয়ার আগেই ঘুমিয়ে পড়ল।

ঘুম ভাঙল কমলিনীর হাতের ধাক্কায়। —পড়ে পড়ে ঘুমোবে খালি, ঘুরতে বেরোবে না?

—আমি তো এখন থাকব কয়েকদিন। প্রলয় একটা হাই তুলতে তুলতে বলল।

—ন্যাকা চৈতন্য; চলো চলো রেডি হয়ে নাও।

প্রলয় ওর হাত ধরে একটা টান দিল সেই মুহূর্তে আর কমলিনী হুমড়ি খেয়ে পড়ল ওর বুকে। প্রলয় ওকে দু'হাতে আঁকড়ে ধরে চুমুর বন্যা নামিয়ে আনল ওর গালে, ঠোঁটে, সারা মুখে। আধো- অন্ধকার ওই ঘরে কমলিনীর মা ঢুকে পড়তে পারেন যে কোনও মুহূর্তে, ওই অবস্থায় ওদের দেখলে প্রলয়কে তখনই বেরিয়ে যেতে বলতে পারেন বাড়ি থেকে, এই সমস্ত ভাবনা ইসরোর রকেটের চাইতেও দ্রুতগতিতে উধাও হয়ে গেল ওর মাথা থেকে। আসলে মাথাই কাজ করছিল না তখন। না ওর, না কমলিনীর। কাজ করছিল দুটো জাগ্রত শরীর, কাজ করছিল প্রলয়ের ঠোঁটের ভিতর কমলিনীর ঠোঁট আর কাজ করছিল দুটো জিভ যারা প্রলয় আর কমলিনীর সমস্ত কথা মিলিয়ে দিচ্ছিল নীরবতায়, কথাকে বদলে দিচ্ছিল কবিতায়। প্রলয় ওর ঠোঁট নামিয়ে আনছিল কমলিনীর গলায়, নামতে চাইছিল আরও নীচে, নদী যেভাবে নামে পাহাড়কে চিরতে চিরতে, পাথরকে গলাতে গলাতে। কিন্তু কমলিনী চকিতে একবার পিছনে তাকিয়ে ঝট করে উঠে দাঁড়াল। ওর বুকের ওপর থমকে থাকা প্রলয়ের হাতটা নিজের হাত দিয়ে শক্ত করে ধরে ফিসফিসিয়ে বলল, পরে আবার।

প্রলয় ওকে ড্রেসিং টেবিলের ওপরে রাখা লিপস্টিক আর নেলপালিশটা দেখাল। কমলিনী হাত বাড়িয়ে সে দুটো হাতে তুলে নিতেই হাজারওয়াট আলো জ্বলে উঠল ওর চোখে মুখে। সেই আলোর খানিকটা ঘরের ভেতর রেখে দিয়েই ও ছুটে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। ফিরে এল তখন বটলগ্রিন সালোয়ার কামিজে রীতিমতো সুন্দরী লাগছে ওকে। পিছমোড়া করে রাখা হাতদুটো হঠাৎ করে প্রলয়কে চমকে দিয়ে ওর মুখের সামনে মেলে ধরল কমলিনী। প্রলয় একটা দমচাপা খুশি ভিতরে নিয়ে খেয়াল করল, ফাগুন লেগেছে নখে নখে।

কিন্তু বেরোবার মুখে কমলিনীর মা যখন খুব নরম গলায় বললেন, 'অত খরচা করে লিপস্টিক, নেলপালিশ আনার কী দরকার ছিল প্রলয়' উত্তুরে হাওয়াটা বইতে শুরু করল আবার।

লঞ্চে উঠে প্রশ্নের পর প্রশ্নে কমলিনীর কাছ থেকে সব জানতে জানতে সেই উত্তুরে হাওয়াটার চরিত্র নির্ণয় করতে পারল প্রলয়। ঠিকই ধরেছিল সে। একটা ভয় কমলিনীদের পরিবারের নিত্যসঙ্গী। আর সেই ভয়টার নাম, 'আগামিকাল'। কী হবে কালকে? কী খাব? কী ভাবে যোগাব মামলার খরচ? কোথায় যাব যদি মামলায় হেরে উচ্ছেদ হয়ে যাই বাড়ি থেকে?

রেস্তরাঁয় বসে চুপ করে কমলিনীর বকবকম শুনতে শুনতে হঠাৎ একসময় ওর হাতটা চেপে ধরে প্রলয় সেই বলল, 'সমস্ত অবস্থায় আমি আছি তোমার সঙ্গে, তোমাদের সঙ্গে...' একটা ম্যাজিক শুরু হল যেন। গভীর নিম্নচাপ সরে গেল, মেঘের কোলে হেসে উঠল রোদ, এলোপাথাড়ি ঘুরতে ঘুরতে একটা তির হঠাৎ করে পেয়ে গেল নিশানা, বাতাসের থেকে

বিকেলে প্রলয় অনেক রিস্ক নিয়ে যে আদর শুরু করেছিল সেই আদরকেই যেন আগ্রাসনের চেহারা দিতে চাইছিল কমলিনী। নদীকে পৌঁছে দিতে চাইছিল মোহানায় যেখানে একটা জলের ভিতরে থাকা নুন অন্য একটা জলের ভিতরে থাকা চিনির সঙ্গে মিলে-মিশে এক হয়ে যেতে চায়, পেলবতায় নয় ভালোবাসা তার প্রকাশ চায়, দাঁতে-নখে-ঘামে-থুথুতে-রক্তে-মাংসে।

ছিটকে এসে খানিকটা আর্দ্রতা ভিজিয়ে দিল চোখের কোণ। আনন্দে।

সেই আনন্দের অভিঘাতে কমলিনী একটা ফুরফুরে প্রজাপতি হয়ে উঠল। সুখের বার্তা নিয়ে যাকে এই দেয়াল থেকে ওই দেয়ালে উড়ে যেতেই হবে। চুঁচুড়ার ঘড়ি মোড়ের সামনে দাঁড়িয়ে ও প্রলয়ের একটা হাত চেপে ধরে বলল, চলো রিকশায় করে ব্যান্ডেলে যাই।

—দেরি হয়ে যাবে না? প্রলয় জিজ্ঞেস করল।

—হলই বা একটু দেরি। বলেই কমলিনী দাঁত দিয়ে নখ কাটল একবার। চুপ করে গেল একটু।

—কী হল?

—না, থাক। এখন রিকশা করে ব্যান্ডেল যেতে আঠাশ-তিরিশ টাকা করে নিয়ে নেবে, অত খরচের দরকার নেই।

—গেলই না হয় ষাট টাকা। প্রলয় মৃদুস্বরে বলল।

—থাক, অনেক ফুটানি হয়েছে। সকালে মিষ্টি, তারপর রেস্টুরেন্ট, আর দরকার নেই।

—ঠিক আছে, অটোয় চলো। অটো যায় না ব্যান্ডেল?

—যায়। কিন্তু আমার এখন অটোর মধ্যে সবার সঙ্গে তোমাকে শেয়ার করতে ইচ্ছে করছে না। কমলিনী হাসল।

প্রলয়ের মনে হল ওই হাসিটার কাছে ও নিজের জীবনের সব আসক্তি বন্ধক রেখে আসতে পারে।

কমলিনী বলল, চলো অন্য একটা জায়গায় যাই। বলে, ওর হাত ধরে হাঁটতে শুরু করল।

প্রলয় জিজ্ঞেস করল না, কোথায় নিয়ে যাচ্ছো আমাকে? ওর খুব ইচ্ছে করছিল পরিপূর্ণভাবে নির্ভর করতে ওই মেয়েটার ওপর যে নিজের সমস্ত ভয়, সব ভালোলাগা বোঁটাসুদ্ধ পানের মতো ছিঁড়ে এনে চুন সুপুরি ছাড়াই সমর্পণ করেছে প্রলয়ের হাতে। প্রলয়ের মনে হচ্ছিল সেই পানটাকে সাজিয়ে একটা রুপোর তবক দিয়ে মুড়ে বুকপকেটে রেখে দেয় সারাজীবন। পারলে হৃৎপিণ্ডের ভিতরেই রেখে দেয়। সব কনট্রাক্টের নীচে যে কথাটা লেখা থাকে সেই 'শর্তাবলি প্রযোজ্য' কথাটাকে ছিঁড়ে কুটিকুটি করে নিঃশর্তে সমর্পণ করে নিজেকে।

তাই করেছিল। কিন্তু হঠাৎ করে কমলিনী যেই বলে উঠল, 'চলো, আমাদের লোকাল প্রেসিডেন্সির ভিতরে চলো' কোত্থেকে একটা বিশমন পাথর এসে পড়ল ওর ওপর। 'প্রেসিডেন্সি', এখানেও 'প্রেসিডেন্সি'?

সিউড়ি থেকে হায়ার সেকেন্ডারি পাশ করে কলকাতায় এসে যখন কলেজগুলোয় অ্যাডমিশন টেস্ট দিচ্ছে তখন বেশ কয়েকবার গেছে ও প্রেসিডেন্সিতে। সায়েন্স সাবজেক্টের ফর্মই তুলতে পারেনি আর ভূগোলে পরীক্ষা দিয়েও নিজের নাম দেখতে পায়নি লিস্টে। সিউড়িতে পড়াশোনায় ভালো ছেলেদের মধ্যেই ধরা হত ওর নাম। কিন্তু প্রেসিডেন্সি ওকে প্রথম বোঝায় যে ও মিডিওকার। যার মতো লক্ষ লক্ষ ফ্যা ফ্যা করে ঘুরে বেড়াচ্ছে রাস্তায়। শেষ যেদিন প্রেসিডেন্সিতে গিয়েছিল ফর্মের লাইনে আলাপ হওয়া একটা মেয়ে ওকে জিজ্ঞেস করেছিল, 'কিসে অনার্স নিলে তুমি?' প্রলয় কোনও উত্তর না দিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে দেখে ওই মেয়েটার পাশে দাঁড়ানো একটা মেয়ে বলেছিল, 'তুমি উইমেন স্টাডিজে অনার্স নিচ্ছ না কেন? এখানে যারা অন্য বিষয়ে চান্স পায় না তারা এই মাঠে, ওই সিঁড়িতে আর বাইরের গেটে দাঁড়িয়ে ওই অনার্সটা করে।'

কথাটা বলেই হো হো করে হেসে উঠেছিল ওই মেয়েটা। ওর পাশে দাঁড়ানো প্রলয়ের পূর্বপরিচিত মেয়েটা একটু লজ্জা পাওয়া গলায় বলেছিল, 'ও একটু ওরকমভাবেই কথা বলে, প্লিজ ডোন্ট মাইন্ড।' কেন মাইন্ড করবে বুঝতেই অনেকটা সময় চলে গিয়েছিল প্রলয়ের। ও যে মিডিওকার! বুঝতে পারার পর অবশ্য একমুহূর্ত ওই চত্বরে দাঁড়িয়ে থাকেনি আর। ফিরেও যায়নি আর কোনওদিন। গৌরাঙ্গ পরে ঘটনাটা শুনে বলেছিল, 'আমার যে মিনার্ভার রাস্তায় তেলেভাজার দোকান, কই আমাকে তো অমনধারা কিছু বলেনি কেউ কখনও।'

—পড়তিস তো নাইটে। ওই চত্বর মাড়িয়েছিস কখনও? রেগে গিয়েছিল প্রলয়।

—নাইটেই পড়ি আর ভোররাতেই পড়ি প্রেসিডেন্সির একটা মেয়ের সঙ্গে মাস ছয়েক প্রেম করেছিলাম আমি। গৌরাঙ্গ হাসতে হাসতে বলেছিল। তারপর যোগ করেছিল, 'তোকে মিডিওকার বলে নয় মফস্সলি বলে আওয়াজ দিয়েছিল মেয়েটা।'

—মফস্সলি কি চেহারায় লেখা থাকে নাকি?

—কারও কারও থাকে। আমি সেই সময়কার তোকে

আন্দাজ করতে পারছি তো। এককালার কিংবা চেকশার্ট পরা, মাথায় গবগবে করে তেল দিয়ে সিঁথি কেটে চুল আঁচড়ানো। আওয়াজ দেবে না?

প্রলয় উত্তর দেয়নি গৌরাঙ্গের সেই প্রশ্নের। কিন্তু ওর মনের মধ্যে ফেনিয়ে ওঠা প্রশ্ন বুদবুদের জন্ম দেওয়া বন্ধ করেনি। হলই বা মফস্সলি, গ্রাম্যই হল না হয়। তবু কেন টন্ট করবে ওভাবে? আর যদি করবেই তাহলে তাদের সংস্পর্শে আর কখনও যাবে না প্রলয়। এতদিন যেমন যায়নি, ভবিষ্যতেও যাবে না। কমলিনীর বাড়ি নৈহাটি শুনে তাই কতকটা নিশ্চিন্ত বোধ করেছিল ও। গত দশ বছর কলকাতার জল খেয়ে পেটে চড়া পড়েও গেলেও ওর ভিতরের কোনও একটা প্যাঁচা ঘুম ভেঙে জেগে উঠেছিল। নৈহাটির নাম শুনে আর প্রলয় লক্ষ্মীলাভের আশা করতে শুরু করেছিল।

কিন্তু মফস্সলের প্রেসিডেন্সির এমাথা থেকে ওমাথা হাঁটতে হাঁটতে ওর সেই আশার বেলুনের গ্যাস ফুরিয়ে যাচ্ছিল। সমস্ত মন্দিরের সামনে যেমন ভিখিরি, সমস্ত আকর্ষণের সিংহদরজায় তেমনই পিছুটান। হ্যাঁ, ওর জীবনের যাত্রা ওকে মিডিওকার করে তুলেছে সর্বার্থে, বরফ যেমন জলের ওপর ভাসতে ভাসতে জলে বিসর্জন দেয় নিজেকে, ও তেমনি বিএসসি-র তিন বছরে বিসর্জন দিয়েছে ওর এমএসসি-র আশা, স্কুলমাস্টারির প্রথম কয়েকদিনেই বিসর্জন দিয়েছে বাকি জীবনে অন্য কিছু হওয়ার আশা। প্রেসিডেন্সি থেকে ও পালিয়ে এসেছে বহুদিন আগে। আর অন্য কোনও চেহারায় তাকে ফেরত পেতে চায় না।

কিন্তু কমলিনী এত সব জানবে কোত্থেকে? কী ভাবে জানবে সেইসমস্ত পাখি, যারা কলকলিয়ে উঠছে সূর্য আছে না অস্ত গেছে বুঝতে না পেরে, কীভাবে জানবে সেই খোকা চাঁদ, সন্ধের আকাশে যার দেয়ালা দেখে মজায় মিটমিট করছে একটা দুটো তারা? কীভাবে বুঝবে কম্পাউন্ডের ভিতরের ওই ধুমসো গাছ যার গায়ে ওকে ঠেসে ধরে কমলিনী বলল, 'এবার তোমার যত ইচ্ছে তত আদর করো।' প্রলয় আলতো করে জড়িয়ে ধরল ওকে। কমলিনী এমন বৈষ্ণবীয় আদর চাইছিল না বলে উশখুশ করল কিছুক্ষণ তারপর খেপি বেড়ালের মতো দাঁত দিয়ে, ঠোঁট দিয়ে আক্রমণ করল প্রলয়কে। বিকেলে প্রলয় অনেক রিস্ক নিয়ে যে আদর শুরু করেছিল সেই আদরকেই যেন আগ্রাসনের চেহারা দিতে চাইছিল কমলিনী। নদীকে পৌঁছে দিতে চাইছিল মোহানায় যেখানে একটা জলের ভিতরে থাকা নুন অন্য একটা জলের ভিতরে থাকা চিনির সঙ্গে মিলে-মিশে এক হয়ে যেতে চায়, পেলবতায় নয় ভালোবাসা তার প্রকাশ চায়, দাঁতে-নখে-ঘামে-থুথুতে-রক্তে-মাংসে। প্রলয় সময়ের কয়েকটা ভগ্নাংশ সেই জোয়ারের মধ্যে

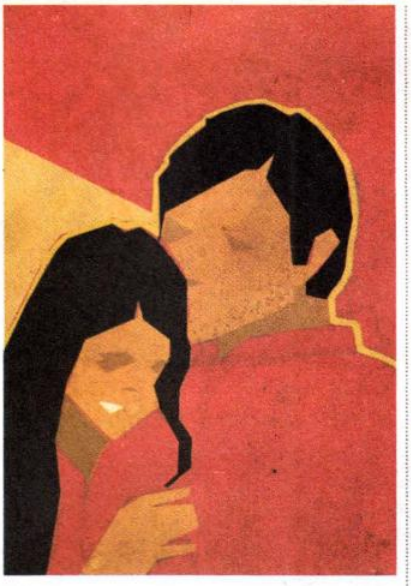

ভেসে যেতে যেতে, বালির স্পর্শে ঢেউয়ের ধাক্কায় সমুদ্রে ডুবতে ডুবতে সামলে নিল নিজেকে। কাঁকড়ার দাঁড়ার মতো শক্ত করে ওকে ধরে থাকা কমলিনীর দুটো হাতের বাঁধন থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে বলল, 'বুঁচু, শান্ত হও বুঁচু। নট হিয়ার, নট নাও।'

কমলিনী একচোখে আঘাত আর অন্য চোখে বিস্ময় নিয়ে তাকাল প্রলয়ের দিকে।

—এটা পড়াশোনার জায়গা। এখানে নয়। প্রলয় একটু গম্ভীর গলায় বলল।

—কিন্তু এখন তো ছুটি চলছে। একটু ভাঙা গলায় বলল কমলিনী।

—চলুক। জায়গাটার মর্যাদা কমে যায় না তাতে, প্রলয় বলল।

লঞ্চে নৈহাটি ফেরার সময় ওরা দু'জনেই চুপ করে ছিল। কমলিনী হঠাৎ বলে উঠল, 'আমি একটুও রাগ করিনি। বরং আরও বেশি ভালো লেগেছে আমার তোমাকে। আমি আমার অনেক বন্ধুর দেখাদেখি যা করতে গিয়েছিলাম সেটা ঠিক নয়। তোমার আদর্শ, তোমার ডিসিপ্লিন সেটা অ্যালাও করে না, আমি বুঝতে পারছি।'

আমার আদর্শ, আমার ডিসিপ্লিন বুঝতে পারছ বলে দাবি করছ, আমার অভিমান বুঝবে না বুঁচু? একজন মিডিওকারের শেষ সম্বল, অভিমান? প্রলয় মনে মনে জবাব দিল।

লঞ্চে ভিড় ছিল না একদম। তার মধ্যেই এদিক-ওদিক দেখে কমলিনীর ঠোঁটে চকিতে একটা চুমু খেল প্রলয়। কমলিনী প্রায় জড়িয়ে ধরল ওকে, আর তখনই কী মনে করে প্রলয় ওদের স্কুলের সেক্রেটারি মনোরঞ্জনবাবুকে মোবাইলে ফোন করে স্পিকারে দিল ফোনটা। বরাবরের মতো এবারও মনোরঞ্জন একবারে ফোনটা ধরল না। মনোবাসনা চরিতার্থ হল প্রলয়ের। নীচে গঙ্গা, ওপরে চাঁদ, বাতাসে পাক খেতে থাকল মনোরঞ্জনের কলার টিউন—'দিলওয়ালো কা দিল কা করার লুটনে/ম্যায় আয়ি হুঁ ইউপি বিহার লুটনে...'

লঞ্চের দু'একজন যাত্রী ইঞ্জিনের ওই আওয়াজের মধ্যেও গানের দু'লাইন শুনে তাকায় ওর দিকে। অবাক চোখে তাকায় কমলিনীও। প্রলয় পাত্তা দেয় না। ওর মনে হতে থাকে, শিবের মাথায় লটকে থাকা চাঁদ আর শিবের জটা থেকে প্রবহমান গঙ্গা—ওকে, কমলিনীকে আর নৈহাটিকে জুড়ে দিয়েছে ইউপি-বিহারের সঙ্গে। প্রলয়কে তাই আজ লড়তে হয়েছে মুখে ফেনা মহিলার খেউড়, টিউকল পাম্প করতে না পারা বাচ্চার অসহায়তার সঙ্গেও।

ও তো কমলিনীকে চেয়ে নিয়ে যেতে এসেছিল নৈহাটি-ভাটপাড়ার সাবেক বাঙালিয়ানার কাছ থেকে। কিন্তু কোথায় সেই সংস্কৃতি? গঙ্গার যাত্রাপথ ধরে ইউপি, বিহার ভেসে উঠেছে এই সব জনপদে; চারটে খুঁটি পুঁতে চটের দেয়াল দিয়ে ঘিরে দিলেই যদি দেশোয়ালিকে বসিয়ে দেওয়া যায় আর ক'দিন পরে রাজনীতির মায়ার খেলায় মিশে যায় প্রত্যেকের রেশনকার্ড, তাহলে গো-বলয়ের গা জোয়ারি আর গুন্ডামি কেন ছড়িয়ে যাবে না নৈহাটি ছাড়িয়ে জগদ্দল, শ্যামনগর অবধি?

না, যে বন্ধ জুটমিলের অন্ধকারে 'বন্দেমাতরম'কে গলা টিপে খুন করার আয়োজন শুরু হয়ে গেছে সেখান থেকে কমলিনীকে ওকে সরিয়ে নিয়ে যেতে হবে। লুট করে নিয়ে যেতে হবে এই প্রসার্যমান ইউপি-বিহার থেকে। নিয়ে যেতে হবে কলকাতায়। সেখানেই বানিয়ে নিতে হবে নতুন মফস্সল।

রিকশায় স্টেশনে যাওয়ার পথে কমলিনী প্রলয়ের কাঁধে মাথা রেখে বলল, 'মনে হয় জন্ম-জন্মান্তর তোমার সঙ্গেই আছি। মাত্র ক'মাস আগে আলাপ হয়েছে আমাদের মনেই হয় না। তুমি বলো, তোমার মনে হয়?'

সেই হাসিটা ধরে হামাগুড়ি দিয়ে ঘষটে ঘষটে লেকের ধারে ফিরে এসে প্রলয় দেখল, ঘড়ির কাঁটা অল্পই এগিয়েছে। বাবা, কয়েক পল অনুপলে এতটা জায়গা কভার করতে পারে স্মৃতি? ভালো খেলোয়াড় তো! স্মৃতিই তাহলে এপ্রিল ফুল করুক ওকে। আবার কমলিনীর সঙ্গে প্রথম আলাপের মুহূর্তে নিয়ে গিয়ে দাঁড় করাক। ভাবতে ভাবতে ঘাসের ওপর গা এলিয়ে দিল প্রলয়।

(চলবে)

অলঙ্করণ: রৌদ্র মিত্র

ইথিওপিয়া

অলক সান্যাল

|| ৪ ||

ইথিওপিয়ার নদ-নদী

ইথিওপিয়ার সবচেয়ে বড় ও গুরুত্বপূর্ণ নদ হল নীল নদ। ইথিওপিয়ানরা নীল নদকে আদর করে ডাকে 'আব্বাই' বলে। আরবরা নীল নদকে ডাকে 'বাহার আল-আজরাক' বলে। নীল নদের উৎস রহস্য নিয়ে অনেক প্রাচীন কৃতী পুরুষই যেমন জুলিয়াস সিজার ও আলেকজান্ডার দি গ্রেট চিন্তা-ভাবনা করেছেন। পরবর্তীকালে দেখা গেছে যে নীল নদের উৎস হল ইথিওপিয়ার সাকালা অঞ্চলের 'গিস' নামে একটা ছোট জায়গায়। উৎসমুখের এই ছোট নদীকে বলা হয় 'ছোট আব্বাই'। এই ক্ষুদ্র জলধারা নিকটস্থ লেক টানাতে গিয়ে মিশেছে। এই 'ছোট আব্বাই'-এর পুণ্য জলধারা প্রাচীন কাল থেকেই ইথিওপিয়ানরা অত্যন্ত শ্রদ্ধার চোখে দেখেছে—পূজা করেছে। এ তো গেল যিশু খ্রিস্টের জন্মের আগের কথা। পরবর্তী যুগে এই ক্ষুদ্র জলধারার পাশে সেন্ট মাইকেলের নামে একটি চার্চ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এখনও বহু ইথিওপিয়ান ভক্ত এই ক্ষুদ্র জলধারায় স্নান করে পুণ্য অর্জন করতে যান। যাই হোক লেক টানার জল প্লাবিত হয়ে 'চারা চারা' ক্যাটার‍্যাক্টের কাছ থেকে 'ব্লু নাইল' নদ ইথিওপিয়ার সমতলভূমির দিকে ধীরে ধীরে বইতে

শুরু করেছে। এই নীল নদ ধীরগতিতে প্রায় এক হাজার মাইল ইথিওপিয়ার মাটি উর্বর করে সুদানে প্রবেশ করেছে। সুদানের রাজধানী খার্টুমে নীল নদ হোয়াইট নাইল বলে আর একটি নদীর সঙ্গে মিলিত হয়ে নাম নিয়েছে শুধু নীল নদ। হোয়াইট নাইল নদীটির উৎস হল আফ্রিকার লেক ভিক্টোরিয়ার। ইথিওপিয়ায় প্রবাহিত হয়ে একটি বিশাল জলপ্রপাত সৃষ্টি করেছে। জলপ্রপাতটি 'টিস-এসাত' বলে বিখ্যাত।

নীল নদের কথায় একটি অবিস্মরণীয় ঘটনা মনে পড়ে। একবার ঠিক করলাম নীল নদের গর্জ বা গভীর খাদে বয়ে যাওয়া নীল নদ দেখতে যাব। রাজধানী আদ্দিস আবাবা থেকে উত্তর দিকে খাড়া পাহাড়ের উপরে প্রায় দেড়শো কিলোমিটার দূরে নদীর গর্জটি ভালো করে দেখা যায়। রাস্তা মসৃণ কিন্তু সম্পূর্ণ নির্জন। আদ্দিস আবাবা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবার আমাদের সঙ্গে যেতে রাজি হলেন। ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রবীণ ব্যক্তি—'মেসোমশাই' বলে ডাকি। তিনি বললেন দুটো গাড়ি নেবার দরকার নেই, ওঁর গাড়িতেই আমার পরিবারও চলে যেতে পারবে। একটা রবিবারের উজ্জ্বল সকালে লুচি, আলুরদম ও জলের পোঁটলা নিয়ে আমরা সবাই রওনা দিলাম। সুন্দর মসৃণ পাহাড়ি রাস্তা। দুপুরের দিকে আমরা পৌঁছে গেলাম গন্তব্যস্থলে। দূর থেকেই গর্জের বা খাদের মনোরম দৃশ্য দেখা যাচ্ছিল। স্তরের পর স্তর পাথরের আস্তরণ। এক এক স্তরের এক একটা রং—হলুদ, গোলাপি, কালো, সাদা। বহু নীচে উচ্ছল নীল নদ বয়ে চলেছে। দূর থেকে মনে হল একটা সুবিশাল ছবি আকাশের গায়ে রাখা আছে। ধীরে ধীরে আমরা গর্জের কিনারায় পৌঁছোলাম। গাড়িটা পার্ক করে মেসোমশাই ও আমি নামলাম। তারপর হেঁটে একটু এগিয়ে একটা উপযুক্ত জায়গা বেছে নিয়ে আমি আমার ক্যামেরার তিনপায়া স্ট্যান্ড ঠিকমতো লাগিয়ে নিয়ে তার ওপর ক্যামেরাটা প্যাঁচ ঘুরিয়ে বসিয়ে দিলাম। তারপর ব্যাগ থেকে টেলিফোটো ও ওয়াইড অ্যাঙ্গেল লেন্স দুটো বার করেছি। হঠাৎ একটা ভীষণ দৃশ্য। আমাদের পার্ক করা গাড়ি ধীরে ধীরে পিছনে গর্জের দিকে এগিয়ে চলেছে। আর মাত্র কয়েক ফুট। তারপরই গাড়িটা প্রায় দেড় হাজার ফুট নীচে পড়ে নীল নদের জলে কোথায় তলিয়ে যাবে। গাড়িতে আছেন আমার স্ত্রী, এক বছরের শিশুকন্যা ও মাসিমা। তিনজনেই পিছনের সিটে বসে চিৎকার করে আমাদের ডাকছেন। আমি বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো লাফিয়ে উঠে উল্কাগতিতে গাড়ির দিকে দৌড়োলাম। কিন্তু গাড়ির কাছে পৌঁছোতে পারলাম না। অসহায় হয়ে দেখলাম গাড়ি খাদের খুব কাছে পৌঁছে গেছে। চোখ বন্ধ করলাম। এক সেকেন্ডও নয়, চোখ খুলে দেখি গাড়ি একেবারে খাদের ধারে একটা পাথরে আটকে দাঁড়িয়ে গেছে। কাছে গিয়ে দরজা খুলে দেখলাম গাড়ির ইগনেশন চাবি লাগানো আছে। স্টার্ট দিয়ে ধীরে ধীরে একটা সমতল নিরাপদ জায়গায় গাড়িটা পার্ক করে চার চাকার সামনে-পিছনে পাথর লাগিয়ে দিলাম। ওঃ তিনটি প্রাণী নবজন্ম লাভ করল। মেশোমশাই ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে দূরে দাঁড়িয়ে আছেন, মুখে কোনও কথা নেই। যাই হোক, সবাই গাড়ির বাইরে চাদর পেতে বসে নরম রোদ্দুরে স্বস্তির নিশ্বাস ফেললাম তারপর আহার পর্ব শেষ করে নীল নদের গর্জের অনেক ছবি তুললাম। তারপর আদ্দিসে ফেরার জন্যে রওনা দিলাম। সন্ধে হব হব। আমরা শহর থেকে দশ-পনেরো কিলোমিটার দূরে আছি। হঠাৎ মেসোমশাই বললেন, 'বাবা অলক, একটা মুশকিল এসে গেল।' আমি উৎসুক দৃষ্টিতে তাকাতে মেসো বললেন, 'গাড়িতে পেট্রোল একদম ফুরিয়ে গেছে, ইঞ্জিন বন্ধ হয়ে গেল।' নির্জন রাস্তা, কাছাকাছি কোনও লোকালয় নেই। আমি এক মুহূর্তে চিন্তা করে বললাম, 'মেসোমশাই, গাড়ি থামিয়ে আপনি আমার জায়গায় আসুন, আমি গাড়ি চালাচ্ছি।' স্থান পরিবর্তনের পর আমি দেখলাম আমাদের গাড়ি অনেক উঁচু পাহাড় থেকে নীচের দিকে নামছে। তাই গিয়ার নিউট্রাল রাখতেই গাড়ি ধীরগতিতে সামনে চলতে লাগল। অবশেষে ভাগ্যক্রমে শহরের প্রান্তেই প্রথম পেট্রোল পাম্পে আমরা পেট্রোল নিয়ে নিরাপদে সন্ধের পর বাড়ি ফিরলাম। ইথিওপিয়ার আর একটি বড় নদীর নাম হল 'টাক্কাজে'। দেশের মধ্যস্থল থেকে যাত্রা শুরু করে এই নদীটি প্রথমে দেশের উত্তরে প্রবাহিত হয়ে পরে যাত্রাপথ পাল্টে পশ্চিমে চলে গেছে এবং এই সময় নদীটির নাম হয়েছে 'সেটিট'। এরপর 'সেটিট' নদী মিশেছে 'আটবারা' নদীর সঙ্গে। এই মিশ্রিত জলধারা সুদানের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। 'আব্বাই'। 'টাক্কাজে' ও 'আটবারা'— এই তিনটি নদীই প্রকৃতপক্ষে ইথিওপিয়ার প্রধান প্রবাহমান জল সমুদ্রের উৎস। আরও কয়েকটি উল্লেখযোগ্য নদী হল 'জুবা', 'ওয়েবি শিবেলি', 'আওয়াশ', 'বোরো' ও 'আকোবো'। অনেক সময় ইথিওপিয়াকে পূর্ব-আফ্রিকার 'জল সম্রাট' বলা হয়। এর কারণ এদেশের ১৪টি নদী তাদের অবিরাম জলরাশি (অনেক পাশ্চাত্য অর্থনীতিবিদ বলেন 'White oil') দিয়ে দেশের মৃত্তিকা সজল ও সিক্ত করে রেখেছে। কিন্তু এই বিশাল জলসম্পদকে মানুষের নানা কাজে লাগাবার এবং দেশের অর্থনৈতিক উন্নতিসাধন করার প্রভূত সম্ভাবনা আছে। ইথিওপিয়ার অধিকাংশ জমিই অত্যন্ত উর্বর। এ ছাড়াও এই ১৪টি খরস্রোতা নদীর জল যদি বাঁধ তৈরি করে ধরে রাখা যায় তাহলে বাঁধের জল থেকে নিয়ন্ত্রিতভাবে প্রচুর জলবিদ্যুৎ তৈরি করে কলকারখানা চালানো যাবে এবং জমিতে জল সেচের ব্যবস্থা করা যাবে।

লেক ও জাতীয় পার্ক

ইথিওপিয়ার সবচেয়ে বড় লেক হল লেক 'টানা'। আয়তন ও গভীরতায় এই লেকটি দেশের অন্যতম প্রধান। এই লেকের আয়তন প্রায় ১২০০ বর্গ মাইল। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে লেকটির উচ্চতা প্রায় ছয় হাজার ফিট। লেকটি দেখতে খানিকটা মানুষের হৃৎপিণ্ডের মতো। লেকের জল দেখতে নীল আর আশেপাশের জমি ঘন সবুজ ঘাসে ঢাকা। লেকের পাশে আছে সুউচ্চ পাহাড়ে। লেকের মধ্যে একটি দ্বীপ আছে— নাম 'ডেক'।

দেশের পূর্ব প্রান্তে কয়েকটি সুন্দর ছোট লেক আছে। সে লেকগুলি হল 'আশঙ্গী', 'হাইআক' এবং 'আরডিব্বো'। দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমেও আছে বেশ কয়েকটি সুন্দর ছোট লেক যেমন 'জাওয়ে', 'লাঙ্গানা', 'শালা', 'আওয়াশা', 'মার্গেরিটা' ও 'স্টিফানি'।

আবিজাতা শালা জাতীয় পার্ক

রাজধানী থেকে প্রায় ২০০ কিলোমিটার দক্ষিণে এই পার্ক দেখতে দেশ-বিদেশ থেকে প্রচুর দর্শনার্থী ভিড় করে। এই পার্কে পৌঁছোবার সহজ উপায় হল প্রথমেই যেতে হবে লেক লাঙ্গানো, সেখান থেকে এই পার্কে পৌঁছোনো সহজ। এই পার্কের আয়তন ৮৮৭ বর্গ কিলোমিটার। কিন্তু পার্কের মধ্যে যে লেক আছে তার আয়তন প্রায় ৪৮২ বর্গ কিলোমিটার। পার্কের উচ্চতা প্রায় ১৫০০ মিটার, তাই এখানের

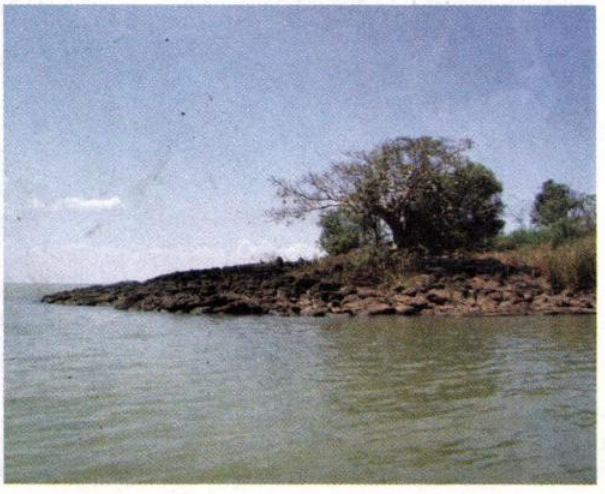

তাপমাত্রা প্রায় ৪৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস। এই অঞ্চলে মার্চ থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত মাঝে মাঝে বৃষ্টিপাত হয়। এই পার্কটি প্রধানত জলজ পাখিদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য তৈরি করা হয়েছে। পার্কের মধ্যে আবিজাতা ও শালা লেকে অগণিত দেশি ও ইউরোপের পাখি এসে খাদ্য সংগ্রহ ও তাদের শিশু প্রসব ও পালন করে।

লেক আবিজাতা ও লেক শালা

একটি জাতীয় পার্কের মধ্যেই লেক আবিজাতা ও লেক শালা অবস্থিত। পাশাপাশি অবস্থিত হলেও লেক দুটির চরিত্র বিভিন্ন। লেক আবিজাতার গভীরতা মাত্র ১৪ মিটার। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হল এই লেকের জল দিনের কোনও কোনও সময় বাড়ে অথবা কমে। 'হোকাকেলো' বলে একটা ছোট নদী থেকে প্রতিনিয়ত পরিশুদ্ধ জল লেক আবিজাতাতে গিয়ে পড়ে। ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি এখানে আসে তৃষ্ণানিবারণ করতে আর পরিচ্ছন্ন জলে স্নান করতে।

লেক শালা অত্যন্ত গভীর লেক। গভীরতায় এই লেকের জুড়ি নেই এদেশে। এখানের জলের গভীরতা গড়ে ৮৫৩ ফিট। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যেও এই লেকের জুড়ি নেই। লেকের জলের শেষে আছে সুন্দর পরিচ্ছন্ন সৈকত। আশে পাশের ছোট ছোট ঝর্ণার উৎসমুখ থেকে বাষ্প উঠতে দেখা যায়। তারপর সেই স্বল্প জলস্রোত ধীরগতিতে লেক শালার জলে মিশে যায়। এ যেন একটা স্বপ্ন।

লেকের পক্ষী সম্পদ

পরিসংখ্যান অনুযায়ী ইথিওপীয়াতে প্রায় ৮০০ প্রজাতির পাখি দেখা যায় তার মধ্যে প্রায় ৪০০ রকম পাখি লেকগুলিতে সব সময় ভিড় করে থাকে। লেক শালার দ্বীপগুলিতেই পাখিদের মূল বাসস্থান কিন্তু খাওয়ার জন্য সুস্বাদু মাছ বেশি পাওয়া যায় লেক আবিজাতাতে। ওখানের জলও হজমি। তাই প্রায় সব পাখীই ভূরিভোজনের জন্যে যায় আবিজাতায়। এই স্বল্প গভীরতার লেকে সব সময় দেখা যায় হাজার হাজার ফ্লেমিংগো ও অন্যান্য পাখি। এক হাঁটু বা এক বুক জলে দর্শকরা অনায়াসেই হেঁটে ফ্লেমিংগোদের খুব কাছে পৌঁছে যেতে পারেন। এটা একটা অনবদ্য অভিজ্ঞতা। কিন্তু কোনও কোনও জায়গায় আছে চোরাবালি। হঠাৎ তাতে পা পড়লেই মহা বিপদ। রঙিন বিচিত্র পাখি ছাড়াও লেক অঞ্চলে আছে নানা রকমের জন্তু জানোয়ার। তাদের মধ্যে অন্যতম হল বড় হরিণ, বন্য শূকর ও সোনালি রঙের শৃগাল। কাছেই আছে পাইনস লেবু ও পাম গাছে ঘেরা সুন্দর আধুনিক হোটেল। হোটেলের বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখা যায় দূরে পাহাড়ের সারি, নির্মল জলের হ্রদ আর আকশে উড়ে যাওয়া বহু বিচিত্র বর্ণের পাখি।

আওয়াশ জাতীয় পার্ক

রাজধানী আদ্দিস আবাবা থেকে সমতল ভূমির দিকে ২৫৫ কিলোমিটার মসৃণ রাস্তা ধরে গাড়ি চালান- তিন ঘন্টায় পৌঁছোবেন আওয়াশ জাতীয় পার্কে। প্রায় পুরো পার্কটাই আওয়াশ নদী দিয়ে ঘেরা। সেখান থেকে নদীটি ডানাকিল মরুভূমিতে প্রবেশ করে তপ্ত বালুতে কোথায় হারিয়ে গেছে। পার্কটির আয়তন ৮২৭ বর্গ কিলোমিটার, বেশির ভাগ স্থানের উচ্চতা ৯০০ মিটার। পার্কের মাঝখানে একটি সুপ্ত আগ্নেয়গিরি আছে, নাম ফানটেন। এই আগ্নেয়গিরির শেষ চূড়াটির উচ্চতা প্রায় ২০০৭ মিটার। সমতল ভূমিতে অবস্থিত বলে পার্কের গড় তাপমাত্রা ৪২ ডিগ্রি সেলসিয়াস। তবে রাত্তির বেলা তাপমাত্রা নেমে ১৫ডিগ্রি সেনসিয়াস হয়ে যায়। ফেব্রুয়ারী থেকে আগস্ট মাস পর্যন্ত পার্কের মধ্যে কিছু বৃষ্টিপাত হয়। এই অঞ্চলে বাবলা (আকাশিয়া) গাছ আর লম্বা ঘাসই বেশি জন্মায়। বছরের সব সময়ই এই পার্কে নানা রকম জন্তু জানোয়ার দেখা যায়। বড় হরিণ, বুনো শুয়োর, ডিক ডিক, চিতা, বাঁদর, কুডু, কচ্ছপ, কুমির ও জলহস্তিগুলো পার্কের মধ্যে দু'পা গেলেই দেখা যায়। আরও একটু গভীরে যান, দেখবেন উট পাখি। এই পার্কের বৈশিষ্ট হল পার্কের মধ্যে ও বাইরে সরকারি উদ্যোগে ক্যাম্পিং করার সুন্দর ব্যবস্থা আছে। ❖

চলবে

ছবি: লেখক

KANHA
Call of the Wild

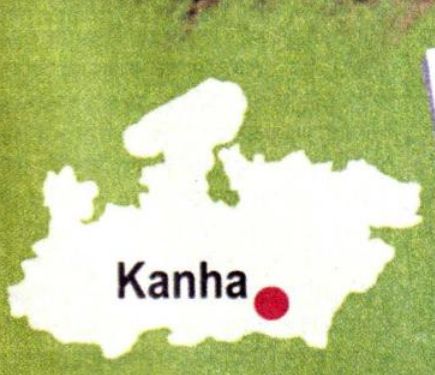

Baghira Log Huts, Kisli

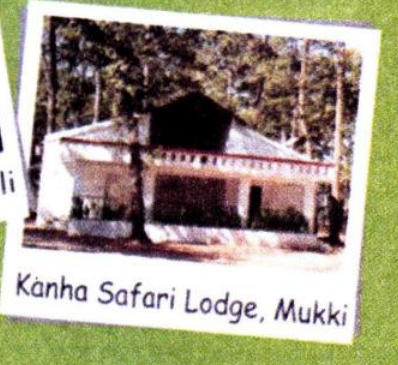
Kanha Safari Lodge, Mukki

The heart of Incredible India

MADHYA PRADESH TOURISM

'Chitrakoot', Room No. 67, 6th Floor,
230A, A.J.C. Bose Road, Kolkata - 700 020
Tel - (033) 22833526, 32979000, 22875855
e-mail - kolkata@mptourism.com
Tourist helpline toll free no. : 1800 233 7777
(8 A.M. to 8 P.M. in Working Days)

বাংলার ভাষা ও থিয়েটার

সুদীপ চক্রবর্তী

আমার স্যারের মেয়ে বুকাই যখন জন্মায়, আমরা কয়েকজন নার্সিংহোমের বাইরে দাঁড়িয়ে ছিলাম। ক্রমশ ও বড় হল। প্রথমে নিজের মতো কী সব উচ্চারণ করত, আমরা কিছুই বুঝতাম না। কোনও একটা শব্দ শেখালে ও উচ্চারণ করার চেষ্টা করত, বার-তিনেক পর ঠিক ঠিক বলেও ফেলতে শব্দটা। এখন সে ক্লাস ফোরের লেডি হয়ে উঠেছে। দিব্যি কথা বলে। ভাষা উচ্চারণের এই প্রক্রিয়াটা আমি নিবিড় ভাবে দেখেছি। জিন, সমাজ ও আমাদের সবার প্রচেষ্টায় আজকের নবজাতক কালকে দিব্যি গড়গড় করে একটা গোটা কবিতা মুখস্থ বলে দেয়। কিন্তু প্রশ্ন হল কী ভাবে আমরা মানুষের ভাষার খোঁজ পেলাম? ঠিক কবে থেকে এবং কী ভাবে মানুষ কথা বলা শুরু করল? কেন অন্য জন্তু জানোয়ার কথা না বলতে পারলেও মানুষ পারল? এই সব প্রশ্নের অনেকগুলির উত্তর পেলেও মোদ্দা ব্যাপারটা আজও রহস্যে ঘেরা।

সম্প্রতি একটা বই হাতে এল। বইটির নাম 'ভাষার মৃত্যু—লুপ্ত ও বিপন্ন ভাষার খোঁজ' লেখক অভীক গঙ্গোপাধ্যায়। বইটির সম্পর্কে কিছু বলার আগে লেখক সম্পর্কে দু-একটি কথা বলে নেওয়া প্রয়োজন। আমরা প্রায়ই আক্ষেপ করি বাংলা ভাষায় সে রকম গবেষক ও ভাষাতাত্ত্বিক প্রায় বিরল। 'ভাষাতত্ত্ব' এই বিষয়টি উচ্চারণ করলেই সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও সুকুমার সেনের নাম মনে আসে। তারপর এই ধারাটি কি বিলুপ্ত হয়ে গেছে? অভীক গঙ্গোপাধ্যায়ের বইটি হাতে পেয়ে মনে হল এখনও আশার আলো প্রজ্জ্বলিত। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যে স্নাতকোত্তর অভীকবাবু। সংস্কৃত, ফরাসি, জার্মান সহ নানা ভাষায় তিনি পারদর্শী ও আগ্রহী, ২০০২ সালে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের 'লাইব্রেরি অফ পোয়েট্রি' থেকে 'এডিটর্স চয়েস অ্যাওয়ার্ড' পেয়েছেন তিনি। বিশিষ্ট ওয়েবজাইন 'লিটারেচার ক্ল্যাসিকস' ও www.indianauthors.in এই দুই জায়গায় বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের কালোত্তীর্ণ সাহিত্যের বিশেষজ্ঞ উত্তরদাতা রূপে একজন তিনি।

বইটির সূচনায় অভীকবাবু একটা পরিসংখ্যান দেন আমাদের, যা বাস্তবিক সচেতন যে কোনও মানুষকে হতবাক করে দেবে। অভীকবাবু জানাচ্ছেন— 'মোট ৪২,১৯২ টি ভাষার মধ্যে আজ ৬৯১২ টি ভাষা এক অর্থে জীবিত; ২০০৬ সাল থেকে প্রতি বছর অন্তত ৩০০০ ভাষার মৃত্যু হচ্ছে। প্রতিদিন গড়ে ৮.১২। অনুমান করা হচ্ছে ২০৫০ সালের মধ্যে ৯৭ শতাংশ জনসংখ্যার মাত্র ৪ শতাংশের কাছে ভাষার উত্তরাধিকার থাকবে। যে ৩৬৯ টি ভাষা মানুষের চিন্তা, মনন ও প্রকাশের চূড়ান্ত পরিণতির সাক্ষী ও উৎকর্ষতায় পৌঁছেছে, তারাও খুব নিরাপদ নয়।'

সত্যি পৃথিবীর বেশিরভাগ ভাষা বর্তমানে বিপন্ন তালিকায় এবং সাধারণ জনমানসের কথা বাদ দিলে শিক্ষিত জনমানসেও এ নিয়ে কোনও হেলদোল নেই। আমাদের ভাবটি এরকম যেন— 'ভাষার মৃত্যু হলে আমার কী? আমি তো বহাল তবিয়তে বেঁচে আছি।' প্রখ্যাত ফরাসি ভাষাবিদ ব্লঁদে হ্যাজেজ বলেছেন 'আমরা যদি এখনও ইংরাজি ভাষার উন্নয়নের গতিপথ সম্পর্কে সচেতন না হই তবে এর পরিণামবশত হয়তো আরও বহু ভাষার মৃত্যু হতে পারে।' আমাদের ভারতীয়দের বিশেষত পশ্চিমবঙ্গের বাঙালিদের অবস্থা খুব শোচনীয়। এখন অনেক আধুনিকা মা বলতে পছন্দ করেন— 'আমার ছেলে বেঙ্গলিটা একদম জানে না।' অভীকবাবুর বই থেকে আরও একটি পরিসংখ্যান দিই 'মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মাত্র ২ জন লিপান অ্যাপাচে ভাষী মানুষ, ৪ জন টোটোরো ভাষী মানুষ, কলম্বিয়ায় এবং ক্যামারুনে মাত্র ১জন বিক্যাভাষী মানুষ জীবিত আছেন।'

অভীকবাবু তাঁর বইটিকে প্রধানত তিনটি পর্বে ভাগ করেছেন। প্রথম পর্বে আছে 'ভাষার জন্ম ও মৃত্যু', 'ভাষার বিলুপ্তি', 'মৃত ভাষার একটি অভিধা', 'ভাষার সূচনা থেকে ভাষার বিপদগ্রস্ত হওয়া', 'ভাষাবিদদের ব্যাখ্যায় ভাষার মৃত্যু: সাক্ষাৎকার ও মতামত', 'ভাষার মৃত্যু: সমীক্ষা ও প্রেক্ষাপটের তাত্ত্বিক পক্ষ, পরিসংখ্যানের বাস্তবতা, সমর্থন ও খন্ডনে ডেভিড ক্রিস্টাল', 'কালানুক্রমিক ভাষার অবলুপ্তির সারণী'। খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় সহস্রাব্দ থেকে আজকে অবধি যত ভাষা অবলুপ্ত হয়েছে সাল সহ সেই পঞ্জি উপস্থিত করেছেন অভীকবাবু আমাদের সামনে। যেমন ২০০৮ থেকে ২০১০ সালের মধ্যে হারিয়ে গেছে আন্দামান দ্বীপ, ভারত, দক্ষিণ ভারত কিংবা আলাস্কার অনেক ভাষা। হারিয়ে যাওয়া ভাষা কোনওটির নাম ছিলো আকা-বো আবার কোনওটির আকা-কোরা। দ্বিতীয় পর্ব ভাগ হয়েছে দু'টি বিভাগে। প্রথম বিভাগের নাম 'অবলুপ্তির আগে: ভাষাগত উৎকর্ষে পৌঁছনো কয়েকটি মৃত ভাষার খোঁজ খবর'। বিভাগ নাম থেকেই এর বিষয় নির্দেশ পাওয়া যায়। হিব্রু, ব্রাহ্মী, মিশরীয় চিত্র লিপি, এট্রুসকান, লাতিন, সুমেরীয়, পালি সম্পর্কে তথ্যমূলক আলোচনা পাওয়া যাবে। দ্বিতীয় বিভাগের নাম 'জীবন্মৃত ভাষা ও লিপি যার পাঠোদ্ধার আজও হয়নি'। 'ফেইসটস ডিস্ক', 'ভিনকা সংকেত', এরমতো প্রায় ৪০০০ জিনিসের মধ্যে যে সিন্ধু সভ্যতার লিপির উদ্ধার হয়েছে আজকেও তার পাঠোদ্ধার সম্ভব হয়নি। অভীকবাবু জানিয়েছেন 'চেষ্টা অনেক করা হলেও এই লিপি পড়তে আজ পর্যন্ত কেউ সফল হয়নি। ভাষাবিদদের মতে এর মূল কারণ হল, এই লিপির দৈর্ঘ খুবই কম। যদিও কিছু তাত্ত্বিকদের ধারণা এ ভাষা প্রাক-দ্রাবিড় জনগোষ্ঠীর, অর্থাৎ আজকের ভারত, শ্রীলঙ্কা, পাকিস্তান, বাংলাদেশ এবং মালয়েশিয়ার ভাষার ভিত্তিভূমি এর মধ্যে নিহিত। এই লিপির অস্তিত্বকাল খ্রি. পূ. ৩৫০০-২০০০, এ অনেক পুরাতত্ত্বিদদের বিশ্বাস।'

ধরুন আপনি আফ্রিকা মহাদেশের 'গাবাকে' ভাষা সম্পর্কে জানতে চান কিংবা সবকটি মহাদেশের মৃত-বিলুপ্ত-বিপন্ন যে কোনও একটি ভাষা সম্পর্কে জানতে চান, আপনি কী করবেন? আগে হলে আমি ইন্টারনেটে সার্চ মেরে বিফল হলে কী করতাম জানি না, তবে এখন থেকে আমি অভীকবাবুর এই বইয়ের আশ্রয় নেব নিশ্চিত। আফ্রিকা, এশিয়া, অস্ট্রেলিয়া, ইউরোপ, মধ্য ও উত্তর আমেরিকা, দক্ষিণ ও লাতিন আমেরিকার সমস্ত মৃত, লুপ্ত ও বিপন্ন ভাষা সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য পাওয়া যাবে। আরও দুটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেছেন অভীকবাবু 'ভারতীয় বিপন্নপ্রায় অপ্রধান ও আঞ্চলিক ভাষা সমূহ' ও 'বর্তমান পৃথিবীর প্রধান জীবিত ভাষার' তালিক ও সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়েছেন তিনি। বাংলা ভাষাতাত্ত্বিক ইতিহাসে এ বই একটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন। অভীকবাবুকে ধন্যবাদ। ধন্যবাদ 'ভাষাবন্ধন প্রকাশনী' কে এইরকম একটি গুরুত্বপূর্ণ বই প্রকাশের জন্য।

'সরল আশ্রয় করে/ প্রাণের আবেগ ভরে/ধরিতে গিয়াছি যারে,/ সে নয় আমার/ হাসিমুখে ঠেলে পায়/ অন্ধ মনে তারে চায়/ পরিনামে ওঠে শুধু ক্লান্ত,/ হাহাকার'। সুধী পাঠক বলতে পারেন এ পংক্তি কয়েকটির রচয়িতা কে? উনিশ শতকের কিংবদন্তি অভিনেত্রী তারা সুন্দরীর রচনা এটি। কবিতার নাম 'প্রবাহের রূপান্তর'। আজও তারা সুন্দরীর জীবন ও

ভাষার মৃত্যু
অভীক গঙ্গোপাধ্যায়
ভাষাবন্ধন। ৩২৫ টাকা

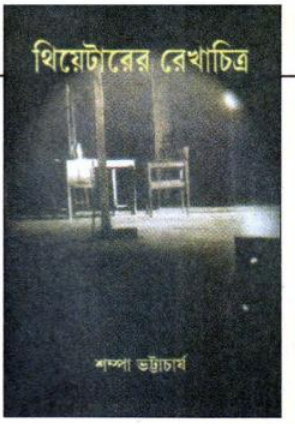

থিয়েটারের রেখাচিত্র
শম্পা ভট্টাচার্য
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ। ১৫০ টাকা

কর্মকাণ্ড সম্পর্কে আমরা সমান ভাবে জানতে আগ্রহী। শম্পা ভট্টাচার্য 'থিয়েটারের রেখাচিত্র' বইয়ে তার। সুন্দরী সংক্রান্ত অধ্যায়ের নামকরণ করেছেন 'তারা সুন্দরী : বাংলা থিয়েটারে উপেক্ষিত প্রতিভা'। সত্যি তাঁর এই নামকরণ সার্থক। তারা সুন্দরী সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত অথচ তথ্যপূর্ণ ও মননশীল রচনা পাওয়া গেল শম্পার কাছ থেকে। থিয়েটারকে নিশ্চিত অন্তর দিয়ে স্পর্শ করেছেন শম্পা, তাই তাঁর প্রতিটি রচনাই আন্তরিক। তাঁর প্রবন্ধগুলির বাক্য বিন্যাস ও প্রকাশভঙ্গি সাধারণ পাঠককেও স্পর্শ করবে। বইটি পড়লে মনে হবে না কোনও থিয়েটার সম্পর্কে গুরুগম্ভীর বই পড়ছি। গূঢ় কথা ও ইতিহাসকে আমাদের সামনে জীবন্তভাবে তুলে ধরেছেন শম্পা। এই যেমন 'তারা সুন্দরী' রচনাতে তিনি এক জায়গায় লিখছেন 'বিনোদিনী ও তারা সুন্দরী একই পাড়ার প্রতিবেশিনী। এই সুবাদে নয় বছরের ছোট্ট তারা, বিখ্যাত অভিনেত্রী বিনোদিনীর হাত ধরে মঞ্চে বালক ও বলিকার ভূমিকায় অভিনয় করতে শুরু করে। মাত্র তেরো বছর বয়সে মিনার্ভা থিয়েটারের অভিনেত্রী হেনা অর্থাৎ হিঙ্গন বালার পরিবর্তে অভিনয় করলেন তিনি সম্পূর্ণ অন্য ধারায় আপন স্বকীয়তায়।' ভূমিকা ছাড়া এ বইয়ে বাইশটি প্রবন্ধ আছে। কোনও আলোচনা 'তৃপ্তি মিত্রের ছোটগল্প' নিয়ে তো কোনওটিকে এসেছে 'সভ্যতার সঙ্কট ও রবীন্দ্র সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত প্রেক্ষাপট'। এ বইটির ভূমিকা লিখেছেন পবিত্র সরকার।

'এইবার আমি নিঘঘাত পাগল হয়ে যাব। বড়ো বড়ো হোডিংয়ে ইয়া বড়ো বড়ো মুখ আমার। জীবনে তো কখনও এত বড়ো মুখ হোডিংয়ে দেখিনি। এর আগে যাও বা দু-চারবার হয়েছে তা সে সব মুখ তো দূরবীন দিয়ে খুঁজে বার করতে হত। এ আমি কী হনুরে।' 'পরশপাথর' ছবি রিলিজের পর রবি বসু কে এই কথা বলেছিলেন বাংলা মঞ্চের দিকপাল অভিনেতা তুলসী চক্রবর্তী। যদিও সরল অহঙ্কারহীন এই মানুষটি নিজেকে বাংলা থিয়েটারের 'হলুদ' বলে ভাবতেন। 'হলুদ' ছাড়া যেমন কোনও তরকারি হয় না তেমনই ছিলেন তুলসী চক্রবর্তী থিয়েটারে। থিয়েটার তাকে কিছুই দেয়নি, তিনি কিছুই চানওনি। জীবনের জন্য নানা রকম জীবিকা গ্রহণ করতে হয়েছে তাঁকে। প্রবল বৈচিত্রময় ছিল তাঁর জীবন-জীবিকা। 'বাংলা থিয়েটারে কোনও সত্যজিৎ রায় ছিলেন না' রচনাটি অনবদ্য। তুলসী চক্রবর্তীর অভিনয় জীবনের প্রারম্ভের অসাধারণ একটি ঘটনার কথা লিখেছেন শম্পা। 'নির্দিষ্ট শিল্পীর অনুপস্থিতিতে 'দুর্গেশনন্দিনী' নাটকে হাকিম সাহেবের চরিত্রে অভিনয় করার সুযোগ পান। হাকিম সাহেববেশি তুলসীবাবু জগৎ সিংহকে পরীক্ষা করে আয়েষা কে বলেন— 'আর রক্ষা নেই— বেগম সাহেব চিন্তা পেয়েছেন।' দর্শক হেসে আকুল হল। বাকি শিল্পীরাও তাই। পরে জগৎ সিংহরূপী তারক পালিত তুলসী চক্রবর্তীর গালে এক চড় মারলেন। আয়েষা রূপিনী তারা সুন্দরী বলে উঠলেন— 'থিয়েটার ছেড়ে দাও — তোমাদের মতো হুজগে ছোঁড়াদের জন্য এসব নয়— অভিনয় রীতিমতো সাধনার জিনিস।' পরে তারা সুন্দরী তাঁকে সান্তনা দিয়ে বলেন— 'দুঃখ কোরো না বাবা— ভালো করে শিক্ষা করো— পারবে। পার্ট ছোট হউক-বড় হউক, তাই হওয়া চাই ধ্যান জ্ঞান।' তারা সুন্দরীর সহ-অভিনেতা এই নবীন শিক্ষার্থী সারা জীবন এ কথা মেনে চলেছেন। উপেক্ষা, অবহেলায় অবিচলিত থেকেছেন। তবেই তো তুলসী চক্রবর্তী বলতে পারতেন— 'টাকার জোরে কি শিল্প সৃষ্টি হয় ভাই? ওটা মনের কাজ। ভালোবাসার কাজ।' একই কথা খাটে 'থিয়েটারের রেখাচিত্র' বইয়ের রচয়িতা শম্পা ভট্টাচার্য সম্পর্কে। এ বইয়ের প্রতিটি পৃষ্ঠায় আমরা সেই মন ও ভালোবাসার স্পর্শ পেয়েছি। বইটির প্রচ্ছদ নির্মাণ করেছেন সুদেষ্ণা ব্যানার্জী। এরকম একটি বই প্রকাশের জন্য 'বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ'কে ধন্যবাদ। ❖

ছিন্নপত্র: কবির অন্তঃজীবনের ভাষ্য

মুনমুন গঙ্গোপাধ্যায়

রবীন্দ্রসাহিত্যের বিপুল সম্ভারের মধ্যে 'ছিন্নপত্র' নিঃসন্দেহে উল্লেখযোগ্য এবং তা উল্লেখযোগ্য তার স্বাতন্ত্র্যের জন্য। ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথের মানস-অনুভূতির আশ্চর্য উন্মীলন এই 'ছিন্নপত্র'। এটি কবির 'ভাবজীবনের ভাষ্য'ও বটে। স্মৃতি, রোমান্টিকতা ও উপলব্ধির অপূর্ব সমন্বয় 'ছিন্নপত্র' ভঙ্গি ও উপস্থাপনা উভয় দিক থেকে পত্রসাহিত্যের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এই চিঠিগুলির প্রতি রবীন্দ্রনাথের গভীর মমত্ব ছিল। ইন্দিরা দেবীকে লিখেছিলেন—'আমাকে একবার তোর চিঠিগুলো দিস—আমি কেবল ওর থেকে আমার সৌন্দর্যসম্ভোগগুলো একটা খাতায় টুকে নেব। কেননা, যদি দীর্ঘকাল বাঁচি...তখন এই সমস্ত দিনগুলো স্মরণের এবং সান্ত্বনার সামগ্রী হয়ে থাকবে।'

১৮৮৫ থেকে ১৮৯৫ এই দশ বৎসর 'ছিন্নপত্র' রচনার সময়কাল। মানুষ ও প্রকৃতির নিবিড় সান্নিধ্য-সিক্ত 'ছিন্নপত্রে' রবীন্দ্রনাথের অন্তঃজীবনের নানা চিত্রও সুউদ্ঘাটিত। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে, এর মধ্যে কবির অন্যান্য সৃষ্টির বীজও সুপ্ত ছিল—কবিতা, গল্প, গানে যার বিস্তার। এর অধিকাংশ চিঠিই যে ভাইঝি ইন্দিরা দেবী চৌধুরানীকে লেখা সে কথা নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না। 'ছিন্নপত্র' রবীন্দ্রনাথের অন্তঃজীবনের ভাষ্য হলেও তা ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের অতীত নয়। তাই পত্রসাহিত্য হিসাবে 'ছিন্নপত্র' এবং

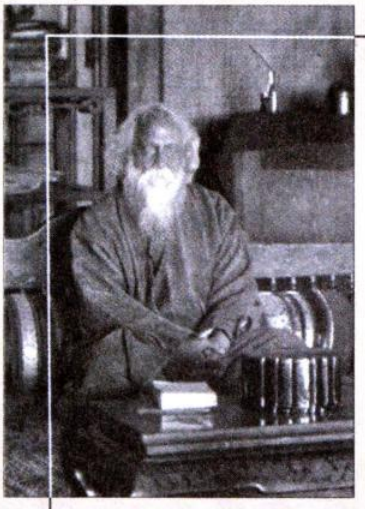

'ছিন্নপত্রে'র সঙ্গে অ-ছিন্নভাবে গেঁথে তোলা রবীন্দ্র-জীবন ও তাঁর জীবনানুভবের বিস্তৃত পরিচয়ে এই গ্রন্থ প্রাবন্ধিকের দৃষ্টিভঙ্গির মৌলিকতাই প্রকাশ করে এবং এর প্রতিটি আলোচনা পাঠক-গবেষকের কাছে গবেষণার নতুন সূত্র-সন্ধান দেয়।

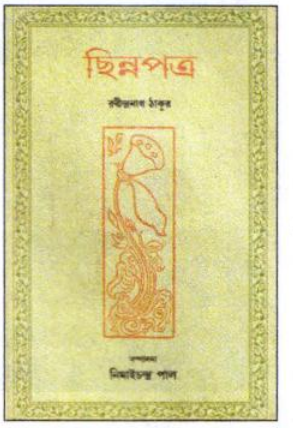

ছিন্নপত্র রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
সম্পাদনা নিমাইচন্দ্র পাল
সারস্বতকুঞ্জ। ২৫০ টাকা

এর ভাষারীতি, 'ছিন্নপত্রে' প্রকৃতি ও মানুষ, ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথের মনের পরিচয় এবং 'ছিন্নপত্রে' কবির কবিতা, গান, প্রবন্ধ, ছোটগল্প ইত্যাদি রচনার উৎস বা উপাদান সন্ধান—প্রভৃতি নানা বিষয়ক আলোচনা এ ক্ষেত্রে করা সম্ভব। 'সারস্বত কুঞ্জ' থেকে প্রকাশিত ড. নিমাইচন্দ্র পাল সম্পাদিত 'ছিন্নপত্র'-এর 'পরিশিষ্ট' অংশে উল্লেখিত প্রতিটি বিষয়ই আলোচনার আলোকপ্রাপ্ত হয়েছে। বর্তমান গ্রন্থটি অবশ্য ১৩১৯ বঙ্গাব্দ বা ১৯১২ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত মূল গ্রন্থের প্রতিলিপি সংস্করণ। তবে পূর্ব প্রকাশের প্রচ্ছদ ও সংকলিত চিত্র অধুনা প্রকাশিত গ্রন্থে অক্ষুণ্ণ ও অবিকৃত রাখা হয়েছে।

'পরিশিষ্টে'র প্রথম প্রবন্ধ 'পত্রসাহিত্য ও রবীন্দ্রনাথ'-এ পত্রসাহিত্য ও সাধারণ সাহিত্যের পার্থক্য বিষয়ক উল্লেখের পাশাপাশি ছিন্নপত্রের সঙ্গে অন্যান্য পত্রসাহিত্যের তুলনামূলক আলোচনাও করেছেন প্রাবন্ধিক এবং কবির অন্য পত্রসাহিত্যের থেকে ছিন্নপত্রের পার্থক্য নির্দেশ করে বলেছেন—'ছিন্নপত্র এসবকে ছাপিয়ে তাঁর অন্তর জীবনের ইতিহাসকে বিবৃত করেছে।'

দ্বিতীয় আলোচনা 'আমার জীবনের অসামান্য উপার্জন : শিলাইদহ-সাজাদপুর-পতিসর'—রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধির বিবরণ। তবে এই 'অসামান্য উপার্জনে' শুধু জমিদারি পরিদর্শন বা সাহিত্যসৃষ্টি নয়, রবীন্দ্রনাথের সমাজগঠনমূলক নানা কাজের উল্লেখ এবং বিবৃতি আছে। যেমন গ্রামোন্নয়ন ও সমবায় ব্যবস্থা, স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও চিকিৎসা ব্যবস্থার উন্নতি, পথ-ঘাট সংস্কার, বিদ্যালয় স্থাপন ইত্যাদি। বিস্তৃত পরিসর এই আলোচনায় রবীন্দ্রনাথের শিলাইদহ-পতিসরের এই প্রয়াস পরবর্তিকালে শ্রীনিকেতন ও শান্তিনিকেতনের বৃহৎ পটভূমিতে কীভাবে রূপায়িত হয়েছে—আলোচক সেই তথ্যও জানিয়েছেন।

'পরিশিষ্টে'র তৃতীয় প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের সকল সৃষ্টির আদি প্রেরণারূপে প্রকৃতির ভূমিকার কথা উল্লেখিত হয়েছে। প্রবন্ধের শিরোনাম—'প্রকৃতির নিবিড় সংস্পর্শে : নানা বর্ণের আলোছায়ার তুলি।' সাধারণ মানুষ ও তাদের জীবনের প্রতি রবীন্দ্রনাথের যে আগ্রহ বরাবরই প্রবল ছিল শিলাইদহ পর্বে তা চরিতার্থ হয়। পারিবারিক বৃত্তের বাইরে এই প্রথম অখ্যাত জনের জগতে এসে পৌঁছেছিলেন কবি। এরপর আর কখনওই এর বাইরে তাঁকে দেখা যায়নি। যে মানবিক বোধে তাঁর অন্তর সিক্ত ছিল উত্তর-জীবনে তা আরও ঋদ্ধ হয়েছে।

বর্তমান গ্রন্থে লেখক কবির মন ও চিন্তাজগতের ধারাবাহিকতার এই পরিচয়টি চমৎকার তুলে ধরেছেন 'মানুষ : নিরন্তর জানাশোনার অভ্যর্থনা' শীর্ষক প্রবন্ধে। সাধারণ মানুষের প্রতি কবির মমত্ববোধের পরিচয়ে তথ্যসমৃদ্ধ এই প্রবন্ধটি উজ্জ্বল।

এইভাবেই হয়েছে 'ছিন্নপত্র'-এ গল্প, কবিতা, গান, ছবি ও প্রবন্ধ সৃষ্টির প্রেরণার অনুসন্ধান প্রাবন্ধিক 'তোরে আমি রচিয়াছি রেখায় রেখায়' প্রবন্ধে শিলাইদহে নদী, তার নির্জন চর, গাছপালার অন্তরালে অস্তগামী সূর্য বা শান্তিময় প্রভাত কীভাবে রূপের রাজ্যে, রেখার ভিড়ে কবিকে চোখ মেলবার অবকাশ করে দিয়েছে, আর কেমন করে তা চিত্রে রূপময় হয়ে উঠেছে—এ বিষয়ে বিশদ আলোচনা আছে।

গ্রন্থের পরিশিষ্টাংশের মোট চোদ্দোটি প্রবন্ধে লেখক সম্পাদক নিমাইচন্দ্র পাল রবীন্দ্রনাথের বিচিত্র সৃষ্টিকর্মের এক-একটি পর্বের পর্দা তুলে ধরেছেন। পাঠকদের পরিচিত করিয়েছেন কবি-মনের নানামুখী ভাবনার সঙ্গে। নিঃসন্দেহে পরিশ্রমসাধ্য এই কাজ। 'ছিন্নপত্রে'র সঙ্গে অ-ছিন্নভাবে গেঁথে তোলা রবীন্দ্র-জীবন ও তাঁর জীবনানুভবের বিস্তৃত পরিচয়ে এই গ্রন্থ প্রাবন্ধিকের দৃষ্টিভঙ্গির মৌলিকতাই প্রকাশ করে এবং এর প্রতিটি আলোচনা পাঠক-গবেষকের কাছে গবেষণার নতুন সূত্র-সন্ধান দেয়।

খুব স্বাভাবিকভাবেই আমরা কবি রবীন্দ্রনাথকে যতখানি চিনি মানুষ রবীন্দ্রনাথকে ততখানি চিনি না। আবার তাঁর সৃষ্টির মধ্য দিয়ে তাঁকে দেখা—এমন দুরূহ কাজ ড. নিমাইচন্দ্র পাল 'ছিন্নপত্র' সম্পাদনা সূত্রেই করেছেন। শেষ প্রবন্ধ 'অন্তরঙ্গ বন্ধু : আমিয়েলস জার্নাল'-এ আঁরি ফ্রেডরিক আমিয়েলের দিনলিপির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 'ছিন্নপত্রে'র তুলনামূলক আলোচনা আছে যা পাঠকের কৌতূহল উদ্রেক করে।

'ছিন্নপত্র' সম্পাদনা করতে গিয়ে শুধু 'ভূমিকা'র পরিমিত-পরিসর বক্তব্যে তাকে সীমাবদ্ধ না রেখে নিমাইচন্দ্র পাল 'পরিশিষ্ট' শীর্ষক একটি স্বতন্ত্র অংশে 'রবীন্দ্রজীবন কোষ' ছিন্নপত্রের তথ্যসমৃদ্ধ আলোচনা ও বিশ্লেষণ করেছেন, যার প্রতিটি প্রবন্ধই মূল্যবান। মনে হয়, এটি সম্পাদিত গ্রন্থ না হয়ে স্বতন্ত্র প্রবন্ধ গ্রন্থও হয়ে উঠতে পারত। আলোচনার পরিসর আর একটু বাড়িয়ে নিলেই তা সম্ভব হত।

কিন্তু সে ক্ষেত্রে 'ছিন্নপত্র'কে সঙ্গে নিয়ে 'ছিন্নপত্রে'র আলোচনা পাঠের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হত পাঠক। তবে এমন গ্রন্থ পুনঃপ্রকাশের জন্য ধন্যবাদ অবশ্যই প্রকাশকের প্রাপ্য। ❖

ক্যামেরার পেছনে

ল্যাডলী মুখোপাধ্যায়

এই তখন সবে স্বাধীনভাবে ছবি তৈরি করার সুযোগ পেয়েছি। নানা কাজে গোল বাধে। ক্যামেরা, লাইট, লেন্স আর কম্পোজিশন নিয়ে মাঝেমধ্যেই হাবুডুবু খাই। নিজের সমস্যা নিজেই সামাল দেওয়ার চেষ্টা করি। সঙ্গে সহযোগী কলাকুশলী মানে টেকনিশিয়ানের দল, তারাও সাধ্যমতো চেষ্টা করে সাহায্য করতে। তখন ছিল অ্যানালগের দিন। যা করবে একবারই করতে হবে। আজকের ডিজিটাল এন-এর মতো কমপিউটারের কারসাজিতে কিচ্ছুটি হওয়ার নয়। মনে হয় সেই কারণেই যন্ত্র ছিল। পরিশ্রম ছিল আর ছিল জানকারি। যেটা সবচেয়ে বড় কথা। আজ যে সব উবে গেছে বলব না। তবে মোদ্দা কথা সিনেমা শিল্পের কাজে যে আমূল পরিবর্তন এসেছে এ নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই। কলাকুশলীদের মধ্যে কর্মসংস্কৃতির ভোল পাল্টে গেছে বেশ কিছু দিন ধরেই। তা নিয়ে এখানে গালমন্দ করতে বসিনি। বরং সেই সময়ের কথা বলতে চাই যেখানে জানকারি আর অভিজ্ঞতার কথা মিলে মিশে গেছে। যেখানে পরিশ্রম আর একাগ্রতা পাশাপাশি থাকে। যেখানে কাজের আনন্দ আছে, শ্রমের স্ফূর্তি আছে—মালঝাল খাওয়াও আছে।

তবে ফিরে যাই আবার শুরুতে। তখন কলকাতা শহরে প্রচণ্ড লোডশেডিং। সম্ভবত এই সময়েই আতঙ্কজনক এই শব্দটি লোকের মুখে মুখে ঘুরতে থাকে। তো একটা ছোট কাহিনিচিত্র তৈরি করছি এরকমই এক সময়। চিত্রনাট্যে ছিল না, কিন্তু নায়কের ভাবনা-চিন্তার একটা দৃশ্যে জুড়ে দিলাম লোডশেডিং। নায়ক নিজে অন্ধকার ঘরে দেশলাই দিয়ে মোমবাতি জ্বালাবে।

সেই প্রয়োজনে লাইট খাটানো হয়েছে। লো-লাইট ফোটোগ্রাফি। আলো বলতে নায়কের টেবিলে একটি মাত্র টেবিলল্যাম্প। হঠাৎ আলো নিবে যায়। নায়ক দেশলাই দিয়ে মোমবাতি ধরায়। সবটাই হল ঠিকঠাক। কিন্তু আমার মনে হল আরেকবার নিতে হবে। কারণ হিসেবে বললাম মোমবাতি জ্বালানোর অনেকটা পরে সাপোর্টিং লাইট জ্বালা হয়েছে, ডিমারে বসেছিলেন তুলসীদা, তুলসী মিত্র। আলোকসম্পাতে তৎকালীন স্বনামধন্য কারিগর। তাঁকে বললাম ঠিক সময়মতো ডিমারটা ঘোরাতে হবে। তুলসীদা মাথা নাড়লেন। আবার শট নেওয়া হল। এবারও সেই একইভাবে আর্টিফিশিয়াল লাইট দেরিতে এল। প্রচন্ড বিরক্ত হলাম। বন্ধুবান্ধবদের কাছে চেয়েচিন্তে ছবি করা। তার ওপর সেলুলয়েড অর্থাৎ ফিল্মে তোলা। তখন 'সেলেটে' লিখে মুছে দেওয়ার মতো ভিডিও টেপে কাজ হত না। ফলে একটা শট বাতিল করা মানে অনেকটা টাকা নষ্ট হওয়া।

এইভাবে পর পর তিনটে টেক বাতিল হওয়ার পর আমার কাছে এগিয়ে এলেন। নায়ককে বললেন, 'আরেকবার জ্বালান মোমবাতিটা।' আমার উদ্দেশ করে বললেন, 'স্যার একবার খালি চোখে দেখুন।' দেখলাম সত্যিই মোমবাতি একসঙ্গে দপ করে জ্বলে ওঠে না। আলো স্তিমিত থাকে প্রথমে, ক্রমে ঘটে ওঠে মানে আলো বিস্তৃতি পায়। ভাবনাম ঠিকই তো, এত মোমবাতি জ্বালিয়েছি এটা তো লক্ষ করিনি। আমার মাইন্ডসেট ছিল দেশলাইয়ের জ্বলন্ত কাঠি মোমবাতির সলতেতে লাগলেই আলো ছড়িয়ে যায়। আদতে যে তা হয় না তা তুলসীদা সেখালেন। এই তুলসীদা তখন প্রায় আমার বাবার বয়সী। আমি আমার সহকারী জীবন থেকেই ফ্লোরে তাঁকে দেখছি। আমি বলতাম তুলসীদা আর উনি বলতেন ল্যাডলীবাবু। পরে যখন চিত্রগ্রহণ ও পরিচালনার কাজ করছি তখন হঠাৎ খেয়াল করলাম তুলসীদা আমায় স্যার বলছেন, যথারীতি বিরক্ত হলাম যার পর নাই। বললাম, কী গো, ও আবার কী ছিরি। আমায় স্যার বলছ কেন? ফ্লোরে কোনও উত্তর না দিয়ে তুলসীদা পাশ কাটিয়ে গেলেন। কাজের পর স্টুডিওতে পরের দিনের সিডিউল ঠিক করতে এর-ওর সঙ্গে কথা বলছি, দেখি তুলসীদা। বললেন, 'একটু কথা ছিল।' ওঁর কাছে গিয়ে বললাম, 'হ্যাঁ বলো। তোমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে আমাকে স্যার বলছ?' তুলসীদা স্বভাব বিনয়ী। বললেন, 'নাগো, তুমি এখন ডিরেকটার ক্যামেরাম্যান। আমি যদি নাম ধরে ডাকি তবে সবাই আশকারা পেয়ে যাবে। আমরা হলাম ইলেকট্রিশিয়ান। আমি যদি তোমায় মান্য না করি তবে কাউকে ফ্লোরে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে না।' এখানেই শেষ নয়। তুলসীদা বললেন, 'তখন তুমি অ্যাসিস্টট্যান্ট ছিলে তাই ফ্লোরে ল্যাডলীবাবু বলতাম। এখন তোমার উন্নতি হয়েছে, ল্যাডলী কেটে বাবু বললে তো তোমার আবার পছন্দ হবে না। তাই শুটিং-এর সময় স্যারটাই মেনে নাও। যাই-ই হও তুমি তো সেই ল্যাডলীই'। এই তুলসীদাই একবার বলেছিলেন, 'তোমার যেন কী বলো, আলো দিয়ে আঁকা ছবি আরও কত বাকওয়াস। আসলে এগুলো কথার কথা। আজকে তা আর কেউ মানে না। যেমন ধরো, আগে আমাদের নামের পাশে লেখা হত 'আলোকসম্পাত'। এখন বলা হয় ইলেকট্রিশিয়ান। কোথায় নামিয়েছ আমাদের। তিনটে তার আর সুইচ-প্লাগ-বাল্‌ব জানলেই সিনেমার আলো করা যায়?

এই তুলসীদাকে দেখেছি যে কতটা কাজের মধ্যে নিযুক্ত থেকে, কাজ ভালোবেসে কাজ করতেন। একবার নীনা গুপ্তের একটা কাজ, আমি ক্যামেরায়। তুলসীদা বাচ্চাদের খেলনার প্লাস্টিকের বল কেটে তার মধ্যে বাল্‌ব লাগিয়ে কী আসাধারণ রিফ্লেকটিভ লাইট করেছিলেন—তা আজও আমার চোখে ভাসে। নেলসন ম্যান্ডেলা যখন কলকাতায় এসেছিলেন তখন আমি একটা ছবি তৈরি করছি। তাঁর সংবর্ধনার দিন শুটিং করতে হবে। গাড়িতে উঠে সবাই শুনলাম অন্য সব কলাকুশলীরা তুলসীদাকে খ্যাপাচ্ছে, 'কালো সাহেবের শুটিং করতে সাদা জুতো পড়েছে তুলসীদা।' দেখলাম সত্যিই একটা ধবধবে কেডস জুতো পরে তুলসীদা কাজ করতে এসেছেন। বললাম, কী হল? তোমার সেই হাওয়াই চপ্পল কোথায় গেল? তুলসীদার গম্ভীর জবাব, 'আজকে ছুটোছুটি দৌড়াদৌড়ি করে কাজ করতে হবে। তাই জুতো পরে এসেছি।' আমি ওঁর কর্তব্য পরায়ণতায় অবাক হয়েছি

একবার নীনা গুপ্তের একটা কাজ, আমি ক্যামেরায়। তুলসীদা বাচ্চাদের খেলনার প্লাস্টিকের বল কেটে তার মধ্যে বাল্‌ব লাগিয়ে কী আসাধারণ রিফ্লেকটিভ লাইট করেছিলেন—তা আজও আমার চোখে ভাসে।

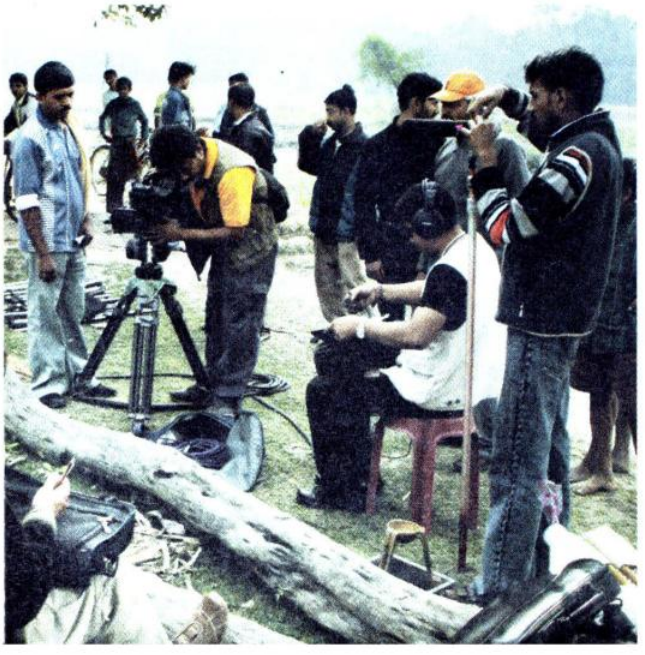

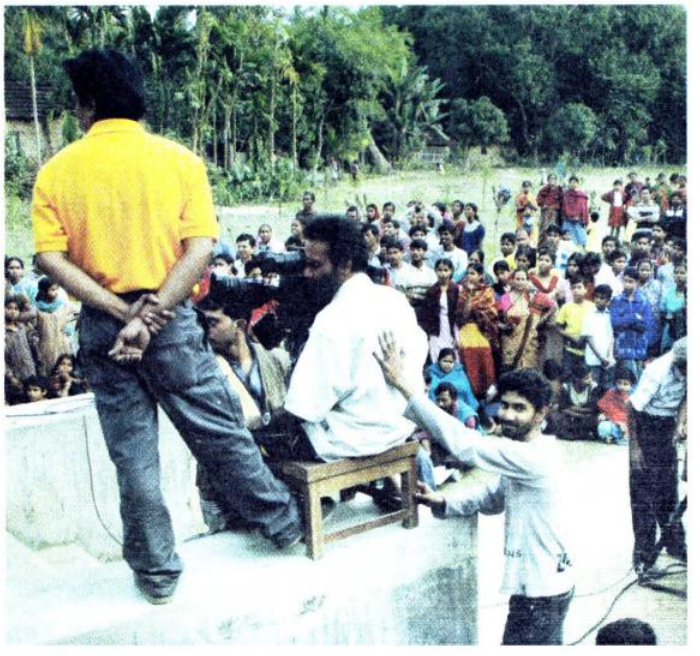

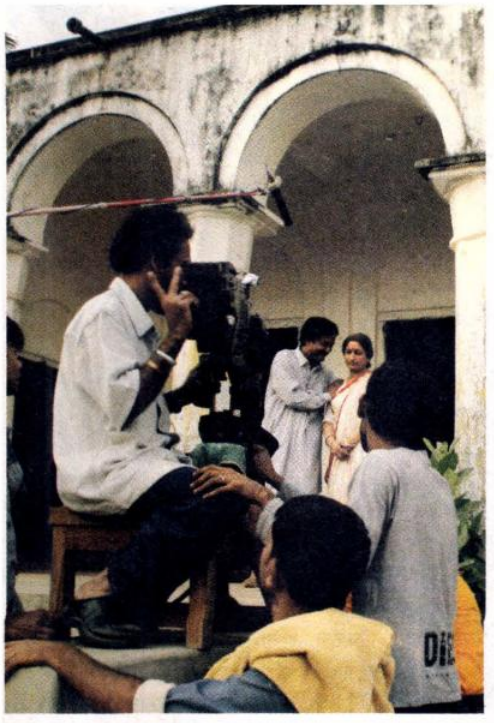

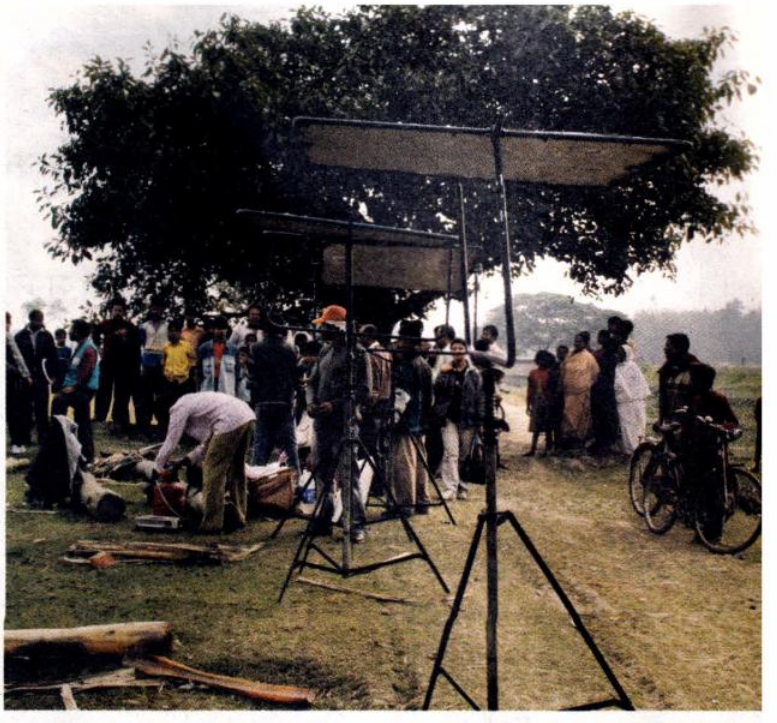

এইরকম কত বার।

আবার ফিরে যাই লেখার শুরুতে, ওই যে লিখেছি, জানকারি আর অভিজ্ঞতা তা নিয়েই একটা ঘটনা বলব। একটা ছবিতে পায়রার দৃশ্য শুট করেছে। এবার এক ঝাঁক পায়রা ওড়ার শব্দ ব্যবহার করতে হবে। সহযোগীদের নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি পায়রার ওড়ার শব্দ তুলতে। দিন যায়, দিনের পর দিন, কিন্তু পায়রা ওড়ার শব্দ পাওয়া যায় না। শব্দযন্ত্রে যে শব্দ ধরা পড়ে তা ডানা ঝাপটানোর নয়, ডানা ঝাপটার ফলে যে হাওয়া তৈরি হয় তার শব্দ। এদিকে টাকাপয়সার হাল খারাপ। একটা নাগ্রা (শব্দযন্ত্র) ভাড়া করা, সঙ্গে লোক-লশকর আর তাঁদের খাওয়া-দাওয়া, গাড়ির খরচ সব বেরিয়ে যাচ্ছে কিন্তু যথার্থ শব্দ ধরা যাচ্ছে না। একজন বুদ্ধি দিল যে সে 'পারিন্দা' সিনেমায় এই পায়রা ওড়ার শট দেখেছে এবং সেখানে শব্দও আছে নিখুঁত। খোঁজ-খোঁজ সেই সিনেমা। পাওয়া গেল। চালিয়ে দেখি সত্যিই পায়রার ডানা ঝাপটার শব্দ আছে। কিন্তু তার পেছনে সঙ্গীতের ব্যবহার আছে। ফলে আবার খোঁজা শুরু হল। ডানা ঝাপটার শব্দ পাওয়া যায় না। সে সময় বয়স্করা নবীনদের কাজকর্মের খোঁজ রাখতেন, উৎসাহ দিতেন। একদিন নিউ থিয়েটার্স (ওয়ান) স্টুডিও থেকে বেরোচ্ছি, দুর্গাদার সঙ্গে দেখা, দুর্গা মিত্র ছিলেন তৎকালীন সময়ের প্রসিদ্ধ শব্দগ্রাহক। রাশভারী লোক। পাইপ খেতেন ঘন ঘন। জিজ্ঞেস করলেন আমার ছবির খবরাখবর সম্পর্কে। সুযোগ পেয়ে বললাম, দুর্গাদা, সবই ঠিকমতো এগোচ্ছে। কিন্তু একটা সমস্যায় পড়েছি শব্দ নিয়ে। দুর্গাদা বললেন, 'শব্দ কোনও সমস্যা নয়। শব্দের সোর্সটা ঠিক মতো ধরতে হবে।' বুঝলাম দুর্গাদা তত্ত্বকথার মধ্যে চলে যাচ্ছেন। কথা ঘোরাতে বললাম, 'না না, সোর্স তো পায়রা। পায়রার ডানা ঝাপটানোর শব্দ। অনেক দিন ধরে চেষ্টা করছি, অনেক টাকা পয়সা খরচ হয়ে গেছে। আপনি কি এর কোনও সুরাহা করতে পারবেন?' যেন কোনও বিষয়ই নয়, এমন একটা ভাব নিয়ে দুর্গাদা বললেন, 'বাড়িতে সাইকেল আছে?' বললাম, 'হ্যাঁ আছে। কিন্তু তা দিয়ে কী হবে?' বললেন, 'ওই দিয়েই হবে। সিগারেটের প্যাকেট কেটে ছোট ছোট স্ট্রিপ তৈরি করে চাকায় যে স্পোকগুলো থাকে তার ফাঁকে ফাঁকে লাগিয়ে দাও। অর্থাৎ একটা স্পোক যেখানে আরেকটা স্পোককে আড়াআড়িভাবে জুড়ে রেখেছে।' বললাম, 'তা নয় হল। কিন্তু শব্দ?' বললেন, 'এবার চাকাটা তুলে ধরে প্যাডেল ঘোরাও আর রেকর্ড করো। ব্যাস, শব্দ পেয়ে যাবে।' কথামতো সেইভাবে সাইকেলের প্যাডেল ঘুরিয়ে শব্দ গ্রহণ করা হল। একেবারে খাপে খাপ। ঠিক যেমনটি চেয়েছিলাম, ঠিক সেই শব্দ। ছবির সঙ্গে চালিয়ে দেখা গেল সত্যিই মনে হচ্ছে এক দল পায়রা শব্দ করে উড়ে গেল।

এই দুর্গাদারই শরণাপন্ন হয়েছিলাম যে কীভাবে কোদাল চালানোর শব্দ তৈরি করা যায়। প্রকৃত কোদাল চালানোর যে শব্দ সেটা কেমন ভোঁতা। মনে হয় ধপধপ করে কিছু একটা পড়ছে বটে কিন্তু তা কোদালের প্রত্যাশিত শব্দ নয়। দুর্গাদা বললেন, 'একটা বড় বাটিতে চাল বা ডাল রাখো। তারপর চামচ দিয়ে খচখচ করে মারো আর রেকর্ড করো, মিলে যাবে।' কখনও জিজ্ঞেস করা হয়নি যে কীভাবে এই শব্দ তিনি আবিষ্কার করেছিলেন। যেভাবে তাঁর কাছেই জানতে পারি একটা প্রকৃত বোমা ফাটার শব্দের পরিবর্তে ভারি দরজা দুম করে বন্ধ করে সঠিক শব্দ তৈরি করতে হয়। সেলোফেনের কাগজ কচলালে টিনের বাড়িতে বৃষ্টি পড়ার শব্দ তৈরি করা যায়। আসলে এ এক বিশাল অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার। এর শেষ নেই। প্রসঙ্গত জানাই, এই দুই মিত্তির মশাইয়ের কোনও ছবি কখনও তুলিনি। সংগ্রহও করতে পারিনি। তাই আপাতত ফিল্ম শুটিংয়ের অ্যাম্বিয়ন্স মনে করাতে অন্য কিছু ছবি লেখার সঙ্গে রাখলাম সম্পাদক মশাইয়ের অনুমতিক্রমে।

আপাতত এইটুকুই। ❖

ছবি: লেখক

সে সময় বয়স্করা নবীনদের কাজকর্মের খোঁজ রাখতেন, উৎসাহ দিতেন। একদিন নিউ থিয়েটার্স (ওয়ান) স্টুডিও থেকে বেরোচ্ছি, দুর্গাদার সঙ্গে দেখা, দুর্গা মিত্র ছিলেন তৎকালীন সময়ের প্রসিদ্ধ শব্দগ্রাহক।

শরাবি কা পিতা কা নাম

সুব্রত সেন

অনেক বছর আগে একবার সোনিয়া গান্ধির মিটিং কভার করতে গুজরাত গেছিলাম। সোনিয়া গান্ধি তখনও কংগ্রেসের সভানেত্রী হননি, হব হব করছেন, এবং একটা দু'টো কংগ্রেসের মিটিং করতে শুরু করেছেন। ওই রকম একটা মিটিং হবে, কংগ্রেসের পক্ষ থেকে সেই মিটিং কভার করতে আমাদের নিয়ে যাওয়া হল আহমেদাবাদে। হোটেলে যে যার ঘরে আমরা সাংবাদিকরা চেক ইন করেছি, প্রথম দিন কারও কোনও কাজ নেই, সোনিয়া গান্ধির মিটিংটা পরের দিন দুপুরবেলা। সুতরাং অনেক কাগজের সাংবাদিক একত্রিত হলে যা হয়, অবধারিতভাবে মদ্যপান ও আড্ডার ব্যবস্থা কী হবে তাই নিয়ে আলোচনা শুরু হয়ে গেল। কংগ্রেসের মুখপাত্র তখন অজিত যোগী, তিনি সাংবাদিকদের সুরাসক্তি সম্পর্কে ভালোই অবহিত এবং মদ জোগাড় করার দায়িত্ব তিনিই নেবেন বলে সাব্যস্ত হল। জোগাড় করা ব্যাপারটা এ ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ, কারণ গুজরাত 'ড্রাই স্টেট', অর্থাৎ সেখানে এমনিতে রাস্তাঘাটে মদের দোকান নেই যে নিজেরা নিজেরা আমরা মদ্যপানের ব্যবস্থা করে ফেলব। যোগী এসে

বললেন, 'এখানে মদ খাওয়ার জন্য বাইরের রাজ্যের লোকেদের টেম্পোরারি লাইসেন্স করিয়ে নিতে হয়। সেই লাইসেন্স থাকলে কয়েকটা দোকান থেকে মদ কিনতে পাওয়া যাবে।' সুতরাং প্রত্যেক সাংবাদিকের নামে একটা করে মদ খাওয়ার লাইসেন্স বের করার ব্যবস্থা হল।

যে কোনও জায়গাতেই দেখেছি, লাইসেন্স অতি বিষম বস্তু, তার জন্য গুচ্ছের ফর্ম ভরতে হয়, এ ক্ষেত্রেও তাই। কিছুক্ষণ পরে লাইসেন্স বানানোর ফর্ম পৌঁছে গেল প্রত্যেক সাংবাদিকের ঘরে, আমার কাছেও এল। হিন্দি ও গুজরাতি ভাষায় তৈরি ফর্মটি, ইংরেজির কোনও বালাই নেই। আমি হিন্দিটা মোটামুটি পড়তে পারি, সেই ফর্মটা পড়ে তো আমার চক্ষু চড়কগাছ। ফর্মে কী রয়েছে তার প্রথম দিকটা মোটামুটি এ রকম:

১। শরাবি কা নাম...
২। শরাবি কা পিতা কা নাম...
৩। শরাবি কা উমর...
৪। শরাবি কা পতা...

আমি তো হাঁ। আমি মদ খাই বটে মাঝে মাঝে, কিন্তু তাই বলে আমি শরাবি? সে তো অমিতাভ বচ্চন ছিল শরাবি সিনেমাটায়। আর যাদের দিনান্তে মদ না হলে চলে না, তাদের শরাবি বলে। আমার তো ও রকম কিছু নেই! কিন্তু গুজরাতে এসে মদ খাওয়ার লাইসেন্স পেতে গিয়ে নিজেকে শরাবি প্রতিপন্ন করতে হল, উপায় নেই যে! মদ খাওয়ার লাইসেন্স বেরোল, বিকেলের মধ্যে সেই লাইসেন্স দিয়ে মদ কেনার ব্যবস্থাও হয়ে গেল, কিন্তু মাথায় বারবার ঘুরতে লাগল, ইসস ছি ছি, কী কাণ্ড, সরকারি খাতায় আমার নাম উঠে গেল 'শরাবি' বলে। কী হাস্যকর ব্যাপার রে বাবা।

পরে হোটেলের বেয়ারাদের কাছে জানতে পারলাম মদ আনানোর জন্য অত পরিশ্রম না করলেও চলত। পয়সা দিলে ওরাও মদ এনে দিত, এবং আমরা সরকারি দোকন থেকে যে দামে কিনেছি, তার থেকে কম দামেই কেনা যেত!

আমরা তো শুনে অবাক। বেআইনি ভাবে মদ কিনলে সাধারণত দাম বেশি পড়ে, এ ক্ষেত্রে উল্টো কেন? কারণটা সোজা। আসলে এই রাজ্যে মদ বিক্রি হয় না বলে আবগারি শুল্কের কোনও ব্যবস্থাই নেই, সুতরাং সরকারকে ট্যাক্স দিতে হয় না। আমরা লাইসেন্স করিয়ে ট্যাক্স দিয়ে বেশি দামে কিনেছি।

গুজরাতে ওই একবারই গেছিলাম। রাজ্যটাকে যে কারণে একেবারেই চিনি না। সত্যি সত্যি সেখানকার লোক মদ না খেয়ে শুধুমাত্র ভার্গিস কুরিয়েনের তৈরি করে যাওয়া অঢেল দুধ খেয়ে বেঁচে থাকে এমনটা আমার বিশ্বাস হয় না। নিশ্চয় কিছু একটা বন্দোবস্ত আছে। যেমন দেখেছিলাম হরিয়ানায়। যখন বছরখানেকের জন্য সেখানে মদ নিষিদ্ধ হয়েছিল, রাজ্যটাকে গুজরাতের মতো 'ড্রাই স্টেট' বানানোর চেষ্টা হয়েছিল।

হরিয়ানার মানুষকে উত্তর ভারতে চলতি কথায় 'জাট' বলা হয়। মদ তাদের দৈনন্দিন খাদ্যতালিকায় পড়ে, এবারে তারা মদ না খেয়ে কী করে বেঁচে আছে দেখতে সেখানে গেলাম। গিয়ে দেখি, ও হরি! মদের দোকান সব বন্ধ বটে, কিন্তু সেই দোকানগুলোর আশেপাশেই বন্ধ হয়ে যাওয়া দোকানের কর্মচারীরা খাটিয়া পেতে মদ বিক্রি করছে। আগের সঙ্গে তফাত হল: আবগারি স্ট্যাম্পটা হরিয়ানার নয়, বরং বোতলে ছাপ মারা রয়েছে, 'হরিয়ানায় বিক্রয়ের জন্য নয়।'

আমি সেবার হরিয়ানা থেকে সেখানকার দিশি মদ কিনেছিলাম, প্রমাণস্বরূপ। হরিয়ানার দিশি মদকে বলে 'টোডি', আমার ধারণা তাড়ি কথাটা সেখান থেকে বাংলায় আমদানি হয়েছে। হরিয়ানার টোডি তৈরি হয় আখের রস থেকে, কিন্তু বিক্রির পন্থাটা খুব অভিনব। বোতলে নয়, মদ বিক্রি হয় মাদার ডেয়ারির দুধের মতো প্লাস্টিকের প্যাকেটে। আমি এ করম অভিনব প্যাকেজিং দেশের অন্য কোথাও দেখিনি!❖

অলঙ্করণ: সুদীপ্ত মণ্ডল

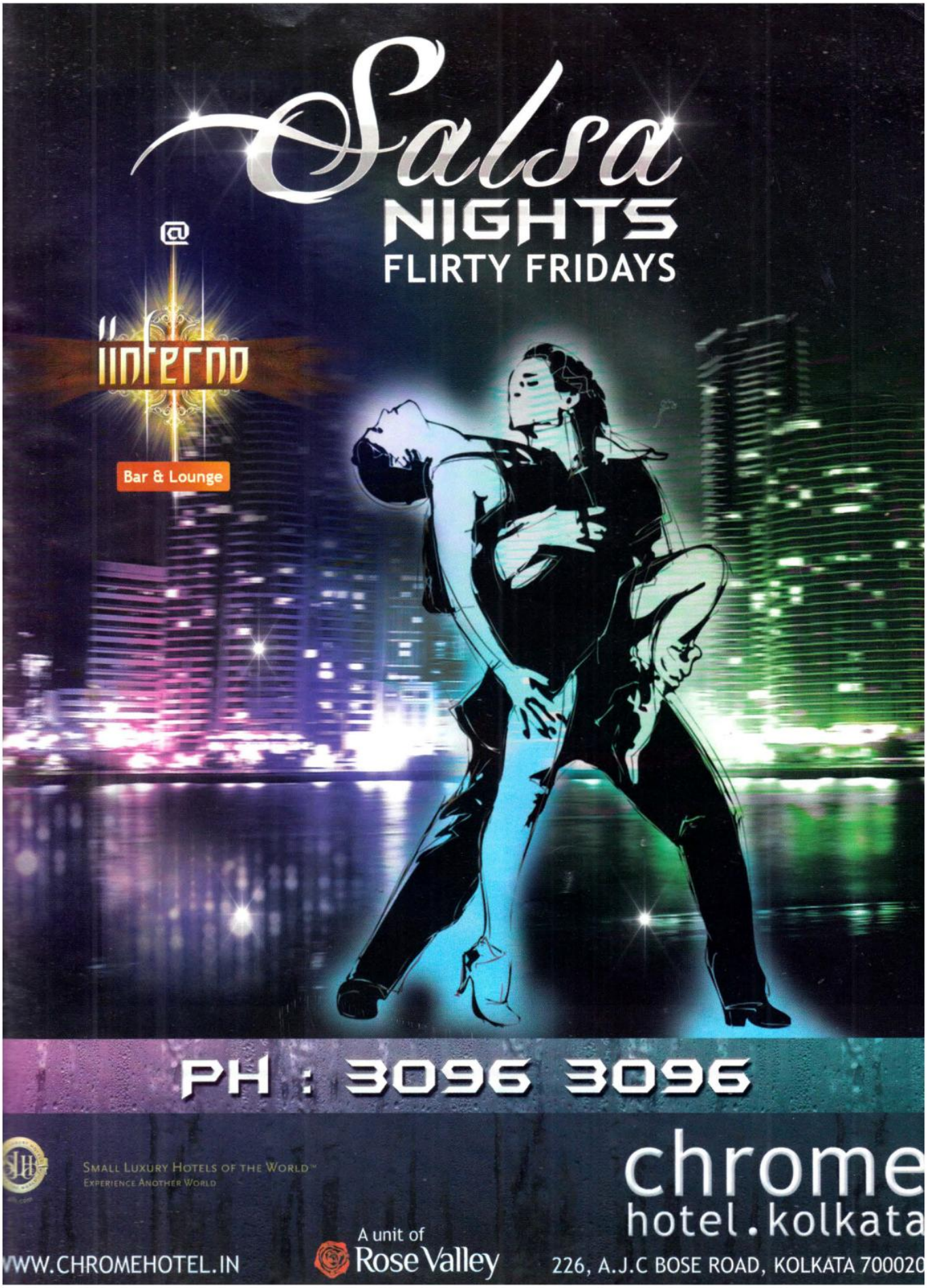
Salsa
NIGHTS
FLIRTY FRIDAYS
@
Inferno
Bar & Lounge
PH : 3096 3096
SMALL LUXURY HOTELS OF THE WORLD™
EXPERIENCE ANOTHER WORLD
chrome
hotel.kolkata
WWW.CHROMEHOTEL.IN
A unit of
Rose Valley
226, A.J.C BOSE ROAD, KOLKATA 700020

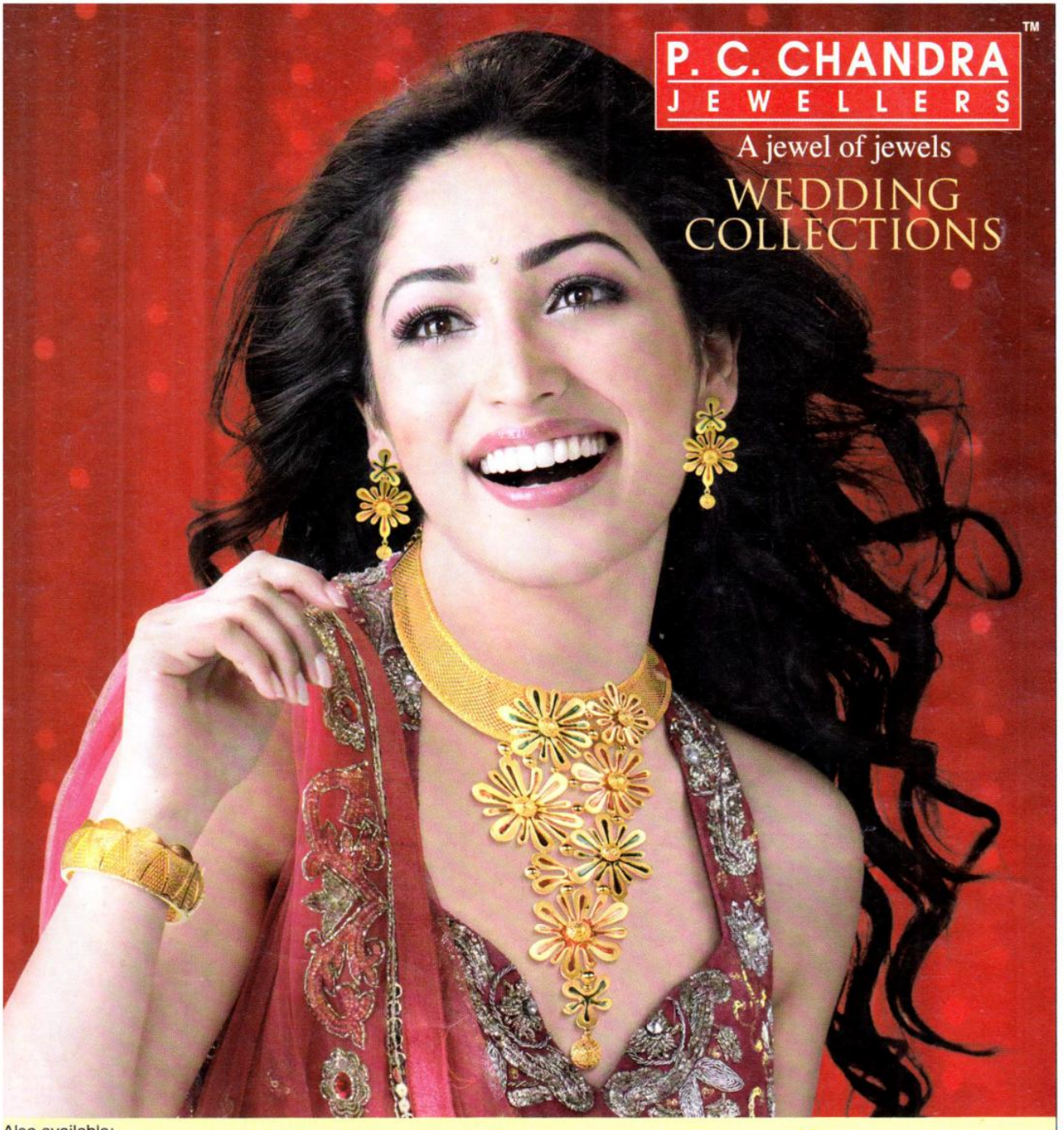

Also available:

D'Elite™
DIAMOND COLLECTION

GOLDLITES™
COLLECTION
Light weight 22K gold jewellery

AN EASY GOLD BUYING SCHEME
SWARNA SANCHAY

ASTRAL GEMS | Old gold exchange facility

Kolkata Showrooms: Bowbazar 22277272; **Gariahat** 24618680; **Chowringhee** 22238062; **Golpark** 24645304; **Ultadanga** 23554747; **Barasat** 25843093; **Serampore** 26526413/14; **West Bengal Showrooms: Asansol** [0341] 2274331; **Siliguri** [0353] 2532194; **Malda** [03512] 256558; **Burdwan** [0342] 2569652; **Midnapore** [03222] 261996; **Berhampore** [03482] 259066; **Cooch Behar** [03582] 228301 **Other States' Showrooms: Delhi** [011] 40616364/26270034/26270002; **Bengaluru** [080] 4934 4444/7795444942; **Bhubaneswar** [0674] 2380887; **Agartala** [0381] 2326666

Toll free no. 1800 419 7225